# সাইমুম-৪১

# আন্দামান ষড়যন্ত্র

আবুল আসাদ

# ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

**ওয়েবসাইটঃ** www.saimumseries.blogspot.com

**ফেসবুক পেজঃ** www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

**ফেসবুক গ্রুপঃ** www.facebook.com/groups/saimumseries

# ১

‘বুঝলাম, হোটেল সাহারা থেকে তোমাদের উদ্ধারের কাহিনী এ জন্যেই তাহলে চেপে গেছ এতদিন। দারুণ রোমান্টিক কাহিনী’ বলল সুষমা রাও। সোফায় শাহ্ বানুর গলা জড়িয়ে ধরে বসে সুষমা।

শাহ্ বানু গলা থেকে সুষমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, বাঁচা-মরার লড়াইয়ের মধ্যে রোমান্টিকতা কোথায় পেলে?’

বল কি তুমি রোমান্টিকতা নয়? দোতলা থেকে স্বপ্ন-নায়কের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া, তা কাঁধে চলে প্রাচীরে ওঠা, তার হাতে ঝুলে নিচে নামা, ইত্যাদি রোজান্টিক নয় বলে মনে কর?’

আমি ঝাঁপিয়ে পড়িনি। দড়ির মই ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলাম। এভাবে পাথরের উপর পড়লে বড় রকমেম কিছু ঘটতে পারতো। তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আর প্রাচীর পাও হওয়ার ময় যা ঘটেছে, ওরকম বিপদে এর চেয়েও বেশি কিছু ঘটতে পারে। আপতকালীন এসব বিষয় কেউ মনে রাখে না, মনে রাখার মত নয়। এখানে রোমান্টিকতা খোঁজা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।’ বলল শাহ্ বানু।

মনে রাখে না বলল, আচ্ছা বলত, ঐ ঘটনা তুমি আমৃত্য ভুলতে পারবে?’

‘মনে রাখা মানে আমি স্মরণ রাখা অর্থে বলিনি। বলেছি, মানুষ এমন ঘটনা রঙিন অর্থাৎ রোমান্টিক চোখে দেখে না। সে রকম দেখা একবারেই অস্বাভাবিক।’ শাহ্ বানু বলল।

‘তোমার সাথে এ নিয়ে তর্ক করবো না শাহ্ বানু। তবে বলব, চোখের পানিতে সুখের স্বপ্ন প্রতিবিম্বিত হতে পারে, হতাশার ঘনঘটার মধ্যে জীবনের প্রদীপ দীপ জলে উঠল বা দু’জীবনের মিলনের বীজ অংকুরিত হতে পারে। তুমি মানতে না চাইলেও এর লাখো দৃষ্টান্ত আছে পৃথিবীর ইতিহাসে।’ বলল সুষমা রাও।

‘দেখ সুষমা, পৃথিবীতে আহমদ মুসা আজ একজনই আছেন। তিনি তোমার ঐ ‘লাখোর মধ্যেকার একজন নন। তাই তোমার দৃষ্টান্ত অচল এখানে।’

‘আমি জানি শাহ্ বানু। আহমদ মুসা ভাইকে এই কথার বলার সাহস আমার নেই। আমি বলছি তোমার কথা। তোমার হৃদয়ের কথা।’

শাহ্ বানুর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরণেই যন্ত্রণার এক কালো ছায়া এসে তা গ্রাস করে নিল। বলল শাহ্ বানু গম্ভীর কণ্ঠে, ‘কিন্তু আমাকে বলছ কেন?’

‘কারণ তোমার মুখে অমূল্য অনুরাগের এক রাঙা রূপ আমি বার বার দেখেছি। কিছুণ আগে ভাইয়ার সাথে কথা বলার সময় দেখেছি এবং এইমাত্রও দেখলাম।’

হাসল শাহ্ বানু। হেসে উঠলেও তার মুখের রাজকীয় লাবণ্য কিন্তু হেসে উঠল না। তাতে জড়ানো বেদনার প্রলেপ। বলল সে ধীর শান্তকণ্ঠে, ‘তুমি যেটা দেখেছ সেটা অন্যায় এবং এক অবাধ্যতা। আমি দুঃখিত তার জন্যে।’

অকস্মাৎ ভারী হয়ে উঠেছে শাহ্ বানুর কণ্ঠ। তার শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটে আছে ঠিকই, কিন্তু তার দু’চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ল দু’ফোটা অশ্রু‘‘।

মুহূর্তেই সুষমা রাওয়ের মুখ থেকে হাসি রসিকতার চিহ্ন উঠে গেল। বিস্ময়-বেদতনার ছায়া নামল তার চোখে-মুখে। বলল সে,’কি ব্যাপার শাহ্ বানু?’ উৎকণ্ঠা সুষমার রাওয়ের কণ্ঠে।

শাহ্ বানু চোখ মুছে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল সুষমা রাওকে। বলল, এস সুষমা এসব আমরা ভুলে যাই। আহমদ মুসা দেড় মাসের বাচ্চা রেখে এখানে এসেছেন এই জীবন-মৃত্যুর অভিযানে। এস আমরা তাঁর জন্যে এবং সেই মিষ্টি বাচ্চার জন্য দোয়া করি।

শাহ্ বানু জড়িয়ে ধরারয় সুষমা রাও নিশ্চল স্থির হয়ে গেছে। গোটা দেহ জুড়ে বয়ে গেল বেদনার এক স্রোত। বলল সুষমা রাও কাঁপা কণ্ঠে, 'তুমি যা বলছ তা সত্য শাহ্ বানু? কার কাছে শুনেছ?'

'আম্মার কাছে।' বলল শাহ্ বানু।

শাহ্ বানু সুষমাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। আগের মতই স্থির, নিশ্চল বসেছিল সুষমা রাও। দু'জনই নিরব।

কয়েক মুহূর্ত পর সুষমা রাও তাকাল শাহ্ বানুর দিকে। বলল নরম ভারী কণ্ঠে, 'এ ভুল তাহলে তুমি কেন করলে শাহ্ বানু।'

শাহ্ বানু নরম ভেজা কণ্ঠে বলল, 'প্রথমে আমি নিজেকেই বুঝতে পারিনি সুষমা। আর সবকিছু শুনলাম আমি আম্মার কাছে যে রাতে তোমার এখানে এসেছি সেই রাতে।'

বলে শাহ্ বানু জাড়িয়ে ধরল সুষমার দু'হাত। বলল, 'আমি সবকিছু ভুলে যাব সুষমা। তুমি কিছু শুনেছ, জেনেছ সেটা তুমিও ভুলে যাও। রসিকতা করেও আমার সম্পর্কে তুমি ওঁর কাছে কোন কথা বলো না।' কান্নায় ভেজা কণ্ঠস্বর শাহ্ বানুর।

চোখের কোণ ভিজে উঠেছে সুষমা রাওয়ের। বলল সে, 'আমার খুব কষ্ঠ হচ্ছে শাহ্ বানু। আমিও তো একজনকে ভালবাসি। তুমি যা বলছ, আমি কি তা পারতাম? পারতাম না।'

চোখের অশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল সুষমা রাওয়ের।

সুষমার হাত ছেড়ে দিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসল শাহ্ বানু। বলল ধীর কণ্ঠে, 'তোমার ব্যাপারটার সাথে আমার তুলনা হয় না সুষমা। তুমি অন্যায়, অস্বাভাবিক কিছু করনি। কিন্তু আমার দ্বারা অন্যায় হয়েছে। অন্যায় তো মানুষেরই

হয়। আমি শুধরে নে....।’ কান্নায় আটকে গেল শাহ্ বানুর কথা। দু’হাতে মুখ ঢাকল সে।

সুষমা রাও শাহ্ বানুর দিকে মুখ তুলে বলল, ‘যদি অন্যায়ই মনে কর, যদি শুধরে নিতেই চাও, তাহলে কাঁদছ কেন।’ ভারী কণ্ঠ সুষমার।

‘এটা আমার দুর্বলতা। আমি শক্ত হতে পারব সুষমা।’ কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল শাহ্ বানু।

কিছু বলতে যাচ্ছিল সুষমা। এ সময় বাইরে তার পিতার গলা শুনতে পেল।

সে তাড়িতাড়ি বলল, ‘শাহ্ বানু বাবা এসেছেন। নিশ্চয় এখানে আসবেন। তোমার নাম মনে আছে তো?’

দু’জনেই তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ মুছে স্বাবাবিক হওয়ার চেষ্টা করল।

সুষমা রাও তাড়াতাড়ি এগুলো দরজার দিকে। দরজাতেই দেখা হয়ে গেল তার আব্বা আন্দামানের গভর্নর বালাজী রাজীরাও মাধবের সাথে।

‘কেমন আছ মা? সুষমা তার আব্বার পায়ে প্রণামের উত্তরে মাথায় হাত রেখে বলল বিবি মাধব।

‘ভাল আছি বাবা। তুমি অফিসে যাওনি?’ সুষমা রাও বলল।

‘কয়দিন খুব পরিশ্রম গেছে মা। আজ একটু রেষ্ট নিব।’

সুষমা রাও তার পিতার হাত ধরে বলল, ‘এস বাবা, বসবে।’

পিতাকে নিয়ে সুষমা রাও ঘরে ঢুকল। ঘরের মাঝ বরাবর আসতেই শাহ্ বানু গিয়ে নিরবে কদমবুছি করল সুষমার আব্বার পায়ে।

সুষমার আব্বা বিভি দাধব অবাক হলো শাহ্ বানুকে ধেকে। তার মাথায় হাত রেখে ‘বেঁচে থাক মা’ বলেই জিজ্ঞাসা কলল, ‘কে তুমি মা?’

শাহ্ বানু মুখ খুলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সুষমা রাও বলল, ‘বাবা আমার বান্ধবী, সঙ্গীতা সাইগর। আমার সাথে পড়ে। বেড়াতে এসেছে আন্দমানে।’

‘বাঃ খুব ভাল । কিন্তু আমাকে তো বলনি? কবে এসেছে?’

‘গত সন্ধ্যায় এসেছে বাবা। তোমাকে বলব কি বাবা, তোমাকে পেলে তো! মা জানেন।’

‘বেশ ভাল। তা এদের বাড়ি কোথায়?’

‘ওরা মাদ্রাজের বাবা।’

‘আমাদের গেষ্ট উইং-এ একজন মহিলাকে দেখলাম। উনি কে জান?’

সুষমা রাও একটু চমকে উঠেছিল। মুহূর্তের জন্য উৎকণ্ঠার একটা ছায়াও নেমেছিল তার মুখে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেকে সামলে নিযে দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘উনি সঙ্গীতার মা। বাবা তোমার সাথে তার দেখা হয়েছিল। কাজে যাচ্ছিলাম, ব্যস্ত ছিলাম। তাই কথা হয়নি।’ বলে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু মা সঙ্গীতার মা’র মাথায় কাপড় দেখলাম। সাইগলরা তো খুবই আধুনিক। ওদের মেয়েরাও সার্ট-প্যান্টে অভ্যস্ত। ওরা তো মাথা ঢাকে না।’

সুষমার বুকটা কেঁপে উঠল। ঠিক বলেছে তার আব্বা। সাইগলরা খুবই আধুনিক। তার ঠিক হয়নি ‘সঙ্গিতা’ নামের সাথে সাইগল লাগানো। যা হোক বিষয়টাকে কভার করার জন্যে সুষমা তাড়াতাড়ি বলল, ‘বাবা’ সবাই কিন্তু একরকম হয় না। বিষেশ করে মেয়েরা। দেখ না কউ সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে যায়। আবার কউ দেখ মাসেও একবার ঠাকুর-মুখো হয় না।’

কথাটা শেষ করেই তার পিতাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে বলে উঠল, ‘বাগানে কি জরুরি কাজ ছিল বাবা?’

‘বাগানটার রিমডেলিং হচ্ছে। বড় করা হচ্ছে বাগানটা। সমস্যা দেখা দিয়েছে একটা কবর নিয়ে। কবরটা না সরালে বাগান বড় করা যাবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে পুরাতত্ব বিভাগ। তারা বলছে কবরসহ জায়গাটা বৃটিশরা স্থায়ী ওয়াকফ করে গেছে। ও জমিতে হাত দেয়া যাবে না।’ বলল গভর্ণর বিবি মাধব।

‘হ্যাঁ বাবা, বাগানের লাগোয়া কবরটা আমি দেখেছি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো। কবরটা এখানে এল কি করে?’

‘সত্যি, কবরটা এখানে আসার কথা ছিল না। এসেছে যে তার পেছনে ইন্টারেষ্টিং একটা কাহিনী আছে। আন্দামান জেলখানার জেলার হিসাবে এসেছিলেন একজন দার্শনিক পণ্ডিত লোক। তিনি দর্শন শাস্ত্রে উপর একটি জটিল বই পড়ছিলেন। অনেক শব্দের অর্থ দএবং কিছু বিষয় তার বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি জেল অফিসের সাবাইকে জানালেন, আন্দামানে এমন কেউ কি আছে যে তাকে শব্দগুলো বুজার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। জেলের এক অফিসার জেলারকে জানায়, আমাদের জেলে একজন কয়েদী আছে, সেই পারে এর ব্যাখ্যাদান করতে।

এই কথা শুনে জেলার অস্থির হয়ে ওঠেন। বলে, এখনি আমার এই গ্রন্থটি তার কাছে নিয়ে দাও। গ্রন্থটি সেই কয়েদিকে নিয়ে দেয় জেলের কয়েদীকে............. শব্দ ও বিষয়সমূহের শুধু অর্থ-ব্যাখ্যাই করা হয়নি, অস্পষ্ট অনেক বিষয়কে ফুটনোট দিয়ে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা ও ফুটনোট পড়ে তিনি বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন যে, এতবড় দার্শনিক তার জেলখানায় কিভাবে কোত্থেকে এল! তাঁর থাকার কথা শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের আসনে! জেলার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখতে চাই এই মহান দার্শনিককে। অফিসাররা তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। মাঠে একজন কয়েদীর কাছে তাঁকে নিয়ে দাঁড় করানো হলো। তিনি দেখলেন, খালি পা, ঘর্মাক্ত গা, কাঁচা-পাকা চুলের জ্যোতিস্মান চোখের এক বয়স্ক ব্যক্তি টুকরি ভরা মাটি মাথায় করে বয়ে নিয় আসছে। বিস্ময় ও বেদনায় বাকহীন হয়ে গেলেন জেলার। এতবড় একজন পণ্ডিত তার জেলখানায় মাটি কাটছে, মাথায় মাটি বইছে! জেলার সাহেব এই পণ্ডিত ব্যক্তির ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরই উদ্যোগে সেই পণ্ডিত কয়েদীর এখানে কবর হয়।’

‘এখান কেন?’ জিজ্ঞাসা সুষমার রাওয়ের।

‘সাগর তীরের এই সুন্দর উচ্চভূমিতে জেলার সাহেব কয়েদীদের জন্য পাঠাগার ও খেলা-ধুলার ব্যবস্থা সম্বলিত ক্লাব ও পার্ক গড়ে তোলেন। এখানেই তিনি কবর দেন পণ্ডিত কয়েদীর। সময়ের পরিবর্তনে সেই ক্লাব কমপ্লেক্সেই আজ গভর্নর হাউজ।’

'কে ছিলেন এই পণ্ডিত কয়েদী বাবা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না গভর্নর বিবি মাধব। একটু ভাবল, বলল, 'কি বলব মা। তার নাম মাওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী। তিনি একজন অতি বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, সেই সাথে একজন আপোষহীন যোদ্ধা। দর্শন শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইসলামী ধর্মতত্ব, সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী। জটিল দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনাসহ বহু গ্রন্থ প্রণেতা তিনি। লাখনৌর নবাব সরকারে তিনি আট বছর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। বৃটিশরা লাখনৌ দখল করলে তিনি বৃটিশের অধীনে চাকরি করতে অস্বীকার করার পর পদত্যাগ করে রাজপথে নেমে আসেন। স্থানীয় শাসক, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচারের জন্যে চারদিকে ঘোরা শুরু করেন। ১৮৫৭ সালে তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে ফতোয়া প্রচার করেন। ফতোয়াটি ভারতে তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা 'সাদিকুল আখবার'-এ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের পাশে তিনি ছিলেন। মোঘল শাসন কিভাবে চলবে ভবিষ্যতে তার দিক নির্দেশনার জন্যে তিনি একটি 'গণতান্ত্রিক সংবিধান' রচনা করেন এবং দিল্লী সম্রাটকে উদ্বদ্ধ করেন নতুন পদ্ধতির শাসনের জন্যে। বৃটিশদের হাতে দিল্লীর পতন ঘটলে তিনি বিদ্রোহ সংগঠনের লক্ষ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। এর পর তিনি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের নায়িকা 'হযরত মহল'- এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং চেষ্টা চালাতে থাকেন দেশীয় শক্তিতে ঐক্রবদ্ধ করতে। এই সময় তিনি বৃটিশদের হাতে গ্রেফতার হন। অফিযোগ আনা হয় যে, তিনি দেশীয় রাজা-জমিদারদের বিদ্রোহ-রক্তপাতে উস্কানি দিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন এবং হত্যা-খুনের মত অপরাধ করেছেন। ১৮৫৯ সালের ৪ঠা মার্চ এক রায়ে বৃটিশ কোর্ট তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দান করেন এবং ১৮৬০ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তর লাভ করেন। ২ বছর পর ১৮৬২ সালে তিনি এই দ্বীপেই ইন্তেকাল করেন।'

'তাহলে তো বাবা তিনি ভারতের বিরাট একজন স্বাধীনাতা সংগ্রামী।' বলল সষমা রাও।

‘না তিনি ভারতের নন, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী তার জাতির। তিনি ভারতে মুসলমানদের শাষন রক্ষার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন। চেয়েছিলেন দিল্লীর মোঘল সাম্রাজ্য টিকে থাক।’

‘একই তো কথা বাবা, দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখা মানে ভারতের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা।’

‘তুমি জানো না, তখন শিবাজী পরিবারের নেতৃত্বে, মারাঠাদের কর্তৃত্বে হিন্দুদের আরেকটা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। দিল্লী সাম্রাজ্য টিকে গেলে তো এই স্বাধনতা সংগ্রাম শেষ হয়ে যেত মা।’

‘কিন্তু বাবা, দিল্লী সাম্রাজ্য টেকেনি, তাকে কি মারাঠীদের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা সংগ্রাম টিকেছিল? বৃটিশরা কি সাবাইকে ধ্বংস করে দেয়নি?’

‘দিয়েছে, কিন্তু পরিণাম ভাল হয়েছে মুসলমানরা ভারতের সাম্রাজ্র চিরতরে হারিয়েছে। কিন্তু শিবাজী-মারাঠার উত্তরসূরীরা আজ ভারতের কর্তৃত্বে আসীন হয়েছে।’ বলল সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব।

‘থাক বাবা এ প্রসঙ্গ। আমি বুঝতে পারছি না বাবা, জেলার সাহেব তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরেও জেল থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারিননি কেন?’ সুষমা রাও বলল।

‘তিনি তাঁর সাধ্যের অধীন সব চেষ্টা করেছিলেন মা। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছিলেন। কিন্তু জেল থেকে মুক্তি জনাব খয়রাবাদীর কপালে ছিল না। বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে মুক্তির আদেশ শত ঘাট পেরিয়ে পৌঁছে খয়রাবাদী সাহেবের ছেলের হাতে। সেই আদেশ নিয়ে তাঁর সন্তান যখন আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের নামেন, তখন খয়রাবাদীকে এই কবরে নামানো হচ্ছিল। জেল থেকে মুক্তির আগেই তিনি দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করেন।’

মুখ ভারী হয়ে উঠেছে সুষমার। ছল ছল করে উঠেছে তার দু’চোখ। তার পিতা থামলেও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটু পর বলল, ‘যে কবর এত বড় একজন মানুষের, যে কবরের সাথে জড়িয়ে আছে এতবড় ট্রাজেডি, সেই কবরে কেন হাত দেবেন বাবা? থাক না স্মৃতিটা।’

হাসল সুষমার পিতা বিবি মাধব। বলল, ‘ব্যক্তি, ব্যক্তির স্মৃতি এবং কবর এক জিনিস নয় মা? আর মুসলিম বিধানে কবর স্থায়ী করার ব্যবস্থা নেই।’

‘কিন্তু এরপরও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজননে কবর স্থায়ী করা হচ্ছে। এটাও বিশেষ ধরণের একটা ক্ষেত্র বাবা।’

‘ঠিক আছে, ক্ষেত্রটাকে বিশেষ মনে করতে পার, কিন্তু এটা কবরের জন্যে বিশেষ স্থান নয় মা।’ বলল সুষমার পিতা।

‘বিশেষ কবরের জন্যে বিশেষ স্থান এখন এটা নয় বাবা। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিশেষ কবরটি এ স্থানে হয়ে গেছে। তাই কবরটা বিশেষ বলে স্থানটাও বিশেষ হয়ে গেছে বাবা।’ বরল সুষমা রাও।

হেসে উঠল সুষমার পিতা গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধব। বলল, ‘সুষমা মা, তোমাকে আর্ট না পড়িয়ে আইন পড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু শোন আমার কন্যা, জাতীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের ‘প্রয়োজন’ আছে যার জন্যে অন্য সবকিছু জলাঞ্জলী দিতে হয়। আমাদেরকে এমন ধরনেরই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।’

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সুষমার আব্বা গভর্নর বিবি রাও। শাহ্ বানুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খুব খুশি হলাম মা, তোমরা এসেছ। কি যেন নাম তোমার?

‘সঙ্গিতা সাইগল।’ শশব্যাস্ত কাঁপা গলায় বলল শাহ্ বানু। মুহূর্তের জন্য তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

‘আসি মা’ বলে দু’জনকে বাই জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব।

সুষমা রাও ও শাহ্ বানু তাকে ঘরের বাইরে পর্যন্ত এসে বিদায় জানাল।

সুষমার পিতা বালাজী বাজীরাও মাধব তার পার্সোনাল ষ্টাডিরুমে এসে দরজা বন্ধ করে বসল।

পকেট থেকে বের করল মোবাইল। একটা কল করল সে।

ওপান্তে থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘স্যার, গুডমর্নিং স্যার, আমি রঙ্গলাল। নির্দেশ করুন স্যার।’

রঙ্গলাল গভর্নন হাউজের গোয়েন্দা ইনচার্জ।

‘শোন রঙ্গলাল। আমার মেয়ের সাথে মাদ্রাজের সঙ্গীতা সাইগল নামে একটি মেয়ে পড়ে। তুমি গোপনে খোঁজ নাও সেই সঙ্গীতা সাইগল ও তার মা এখন কোথায়?’ এ প্রান্ত থেকে বলল গভর্নর বিবি মাধব।

‘ওকে স্যার। আর কিছু নির্দেশ, স্যার।’ গোয়েন্দা অফিসার ওপ্রান্ত থেকে বলল।

‘ভাইপার দ্বীপে যে লাশগুলো পাওয়া গেছে, তার কোন হদিস মিলল?’

‘না স্যার। মনে করা হচ্ছে, কোন আন্তগ্যাং-এর মধ্যে কোন সংঘাত ওটা।’

‘এ ধরনের দায়সারা গোছের কথা ছেড়ে দাও। যাদের লাশ ওখানে পাওয়া গেছে, তাদের সাবার কপালে চন্দনের বিশেষ ধরনের তিলক আঁকা। এ ধরনের লোকরা জগৎমাতার সেবক হয়ে থাকে। এখন যেটা দেখার সেটা হলো, জগৎমাতার এই সেবকদের কারা হত্যা করল?’ বলল গভর্নর।

‘স্যরি স্যার। ওদের কাছে রিভলবার পাওয়া যায়নি, কিন্তু প্রত্যেকের পকেটে রিভলবারে বুলেট পাওয়া গেছে। ওদের রিভলবারগুলো প্রতিপক্ষরা নিয়ে গেছে মনে করা হচ্ছে। এই দিকটার কারণেই সম্ভবত ঐ কথা বলা হয়েছে। স্যরি স্যার।’ গোয়েন্দা অফিসার বলল।

‘ধন্যবাদ। হোটেল থেকে সোমনাথ শম্ভুজী এবং তার দু’রক্ষীকে যারা গায়েব করেছে, তারাই ভাইপার দ্বীপে জগৎমাতার সেবকদের হত্যা করেছে। সাহারা হোটেলের ভেতরেই কোন রহস্য আছে। গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কি হোটেলের সব বাসিন্দাদের সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছে?’ বলল গভর্নর।

‘নিয়েছে স্যার। শুধু পাওয়া যায়নি ‘বেভান বার্গম্যান’ নামের একজন আমেরিকান ট্যুরিষ্টকে। আর পাওয়া যায়নি আহমাদ শাহ্ আলমগীরের মা ও বোনকে। তারা সোমনাথ শম্ভুজীদের মতই যেন হাওয়অ হয়ে গেছে।’ গোয়েন্দা অফিসার বলল।

‘কিছুক্ষণ আগে পুলিশ প্রধান আমাকে জানিয়েছেন, সব তথ্য একত্র করার পর তাঁরা মনে করছেন যারা আহমদ আলমগীরকে গায়েব করেছে তারাই আবার আলমগীরের মা-বোনকে মিথ্যা ব্লাফ দিয়ে ভিন্ন নামে হোটেলে এসে

তুলেছিল কোন উদ্দেশ্যে। পরে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে এই আশঙ্কা থেকে তাদের আবার হোটেল থেকে সরিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু কোন পথে সরিয়ে নিল, শম্ভুজীদের পাওয়া যাচ্ছে না কেন, এর জবাব পুলিশ প্রধানের কাছে নেই। আচ্ছা হাজি আব্দুল্লাহ আলীর খবর কি? উনি কি বলেন?' জিজ্ঞেস করল গভর্নর।

'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তিনি হোটেলে থাকেন, তারপর তিনি বাসায় চলে যান। সেদিনও তাই গেছেন।'

'আপনারা বাড়িতে তার খোঁজ করেছেন? কথা বলেছেন তার সাথে হোটেলের সব ব্যাপার নিয়ে?' গভর্নর বলল।

'স্যার আমি এটুকু শুনেছি যে, পুলিশের উপস্থিতিতে হোটেলের লোকরাই তার বাসায় টেলিফোন করেছিল। হাজী সাহেব বাসায় ছিলেন না। বাসা থেকে বলা হয়েছিল, আটটার দিকে কোথাও তাঁর একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সেখানেই তিনি গেছেন।' বলল গোয়েন্দা অফিসারটি।

'ঠিক আছে। আমি মনে করি, তাঁর উপর নজর রাখা.............। না থাক, ওটা আমি দেখব।'

বলে একটু থেমেই গভর্নর আবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তোমাকে যেটা বলেছি, সেআ তাড়াতাড়ি জানা দরকার। এখনি কাজ শুরু কর।'

'ইয়েস স্যার।' বরল গোয়েন্দ অফিসারটি।

'ওকে।' বরৈ গভর্নর মোবাইল অফ করে দিল।

অস্বস্তি ও উদ্বেগের একটা ছায়া তার চোখে-মুখে উদ্বেগের কারণ হলো, তরুণী ও মহিলার যে পরিচয় তার মেয়ে সুষমা তাকে দিয়েছে, সেটা সে গ্রহণ করতে পারছে না। তরুণীর চোখে-মুখে সে শংকা-ভয়ের ছায়া দেখেছে। বেড়াতে আসা সাইগল পরিবারের কারও মুখে এই শংকা, ভয় থাকবে কেন? আর তরুণীটির চেহারা যেন তার কাছে চেনা মনে হচ্ছে এই চেহারা যেন সে কোথাও দেখেছে তাহলে কি ওদের কোন মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে? কেন দেবে? এখানেই তার অস্বস্তি লাগছে।

উদ্বেগ-অস্বস্তির ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল গভর্নর বিবি মাধব। ভাবল, মাদ্রাজ থেকে সাইগল পরিবারের খবরটা এলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে।

মোবাইলটা পকেটে রাখল বিবি মাধব।

আন্দামান সাগরের বুক চিরে একটা বোট এগিয়ে চলেছে রস দ্বীপের দিকে।

বোটে একমাত্র আরোহী আহমদ মুসা। সেই বোট চালাচ্ছে।

এভাবে একটা বোট চালিয়ে 'রস' দ্বীপে আসা নিয়ম নয়। সরকারি ট্যুরিষ্ট কোম্পানী আছে, তাদের বোটে আসাতে হয়। সরকারি বোট চালকারই নিয়ে আসে। কিন্তু আহমদ মুসার বিশেষ মার্কিন পাসপোর্ট এবং বিশেষ ভিসার কারণে আহমদ মুসাকে একটা বোট নিয়ে 'রস' দ্বীপে যাবার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত দিয়েছে, 'রস' দ্বীপের নৌ-পোর্টে গিয়ে নৌবাহিনীর কাছে তাকে রিপোর্ট করতে হবে।

হাজী আব্দুল্লাহও তাকে একা ছাড়তে চায়নি। বলেছে, রস দ্বীপ একন যেমন নিরাপদ, তেমনি বিজ্জনকও। দ্বীপটি ভারতীয় নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে বলে নিরাপদ, কারণ কোন ধরনের কোন সিভিল লোক এখানে বাস করে না। কিন্তু বিপদের কারণ নৌবাহিনী নিজেই। কারণ, তারা কাউকে সন্দেহ করলে দ্বীপেই তাদের কবর হয়। তারা মনে করে, কোন বিদেশী গোয়েন্দা ছাড়া কেউ ছাড়া সন্দেহজনক কেউ ঐ দ্বীপে যায় না। কিন্তু আহমদ মুসা হাজী আব্দুল্লাহর অকাট্য যুক্তি ও জেদ সত্ত্বেও তাকে সাথে নেয়নি। বলেছে, হাজী আব্দুল্লাহ দ্বীপে যাওয়ার বিশেষ অনুমতি পেলেও তার 'রস' দ্বীপে যাওয়াকে পুলিশ ও গোয়েন্দারা সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখতে পারে। সন্দেহ করার কারণে গোয়েন্দারা যদি আহমদ মুসাদের অনুসরণ করে, তাহলে দ্বীপে যাওয়ার তাদের আসল লক্ষ্যই বানচাল হয়ে যেতে পারে। হাজী আব্দুল্লাহ অবশেষে আহমদ মুসার যুক্তির কাছে হার মেনেছে।

আহমদ মুসা দু'হাতে বোটের ষ্টিয়ারিং ধরে সামনে স্থির দৃষ্টি রেখে 'রস' দ্বীপের কথাই ভাবছে। এক সময় 'রস' দ্বীপ ছিল আন্দামানের সবচেয়ে জমকালো

দ্বীপ। কয়েদী জনসাধারণের জন্যে ভীতিকর প্রশাসনিক বিল্ডিং-এর সারি ছিল এই দ্বীপে। ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ আবাসিক বাড়ির মনোরম দৃশ্য। শাসনকারী শ্বেতাংগদের বেড়ানোর জন্য ছিল সুদৃশ্য পার্ক ও বীচ, ছির তাদের খেলার জন্য গল্ফ কোর্ট, পোলো গ্রাউন্ড। সাঁতার কাটার জন্যে অনেক স্যুইমিং পুল। ভু-পৃষ্ঠ ও ভূগর্ভে ছিল সারি সারি সামরিক ও পণ্য-গোডাউন। ১৯৪১ সালে এক ভুমিকম্প সব কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। এই ধ্বংস দ্বীপকে ফিরেয়ে দিয়েছে আগের অবস্থায়। দ্বীপ এখন বড় একটি জংগল। ভারতীয় নৌবাহিনীর লোক ছাড়া দ্বীপে কোন মানুষ  নেই। এই প্রচার সত্য হলে, দ্বীপে শাহ্ আলমগীর বন্দী থাকার প্রশ্ন আসে কি করে। কে তাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে যদি সেখানে কারো যাতাযাত না থাকে? তাছাড়াও মনে করতে হবে, সবকিছু সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিছু বাড়ি কিংবা গোডাউন অক্ষত আছে যেখানে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে বন্দী করে রাখতে পারে। সত্যিই কি আহমদ শাহ্ আলমগীর সেখানে বন্দী আছে? গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধবের একটা উক্তিকে সামনে রেখে আহমদ মুসা 'রস' দ্বীপে যাচ্ছে। সুষমা রাও তার পিতা গভর্নর বালাজী বাজীরাওকে বলতে শুনেছিল রস দ্বীপের কোন গোডাউনে কাউকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ভাইপার দ্বীপে গঙ্গাধরকে যারা বন্দী রেখেছিল, তাদের নেতা স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিও এ ধরনের কথা বলেছিল বলে গঙ্গারাম জানিয়েছিল। এ দু'টি অস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ করে না যে, আহমদ শাহ্ আলমগীর ঐ দ্বীপেই আছে, আবার এ সন্দেহও সৃষ্টি করে যে ঐ দ্বীপে তাকে রাখা হতে পারে। আন্দামান সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকরা এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে, আহমদ শাহ্ আলমগীরকে 'রস' দ্বীপে রাখা যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। আর এটা সত্য হলে স্বয়ং বালাজী বাজীরাও মাধব ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। হাজি আব্দুল্লাহর অতীত কাহিনী এবং ইসরাইলী সহযোগিতার তথ্য বালাজী বাজীরাও এর সাথে জড়িত থাকার সন্দেহকে আরো ঘনিভূত করে। কিন্তু এ সন্দেহে একটা অনুমান মাত্র।

সামনে প্রসারিত আহমদ মুসার চোখে 'রস' দ্বীপটি দিগন্তে কাল রেখার মত ফুটে উঠল। আহমদ মুসার মাথায় ভাবনা এল, তার বোটটিকে সে দ্বীপের কোথায় দাঁড় করাবে? 'রস' উপকূলে দু'ধরের ঘাট আছে। ট্যুরিষ্ট বোটগুলোর

জন্যে একটা ঘাট, আর কিছু আছে নৌবাহিনীর ঘাট। বেসরকারী কোন নৌযান নৌবাহিনীর ঘাটে ভেড়ার অনুমতি নেই। নৌবাহিনীর ঘাঁটি দ্বীপের দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর উপকূলে একটি করে। আর ট্যুরিষ্ট বন্দরটি দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের অধিকাংশ বেসরকারি নোঙরের জন্য জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। এই উপকূল জুড়েই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এক সময়ের প্রাচ্যের প্যারিসের ধ্বংসাবশেষ। আন্দামানের প্রশাসনিক কেন্দ্র সাজানো-গোছানো মনোরম 'রস' দ্বীপকে বলা হতো প্রাচ্যের প্যারিস। সেই প্রাচ্যের প্যারিস এখন জংগলাকীর্ণ ধ্বংসের স্তুপ ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকেই মনে করেন, দ্বীপ-কারাগার আন্দামানের হাজারো কয়েদীর জীবনব্যাপী কান্নার অভীশাপে ধ্বংস হয়েছে প্রাচ্যের প্যারিস নামের আন্দামানের এই রাজধানী। আহমদ মুসার ইচ্ছা মূল ধ্বংসপুরিতেই ল্যান্ড করা। আহমদ মুসা চিন্তা করেছে উপকূলের কাছাকাছি গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর হয়ে দ্বীপটাকে একটা রাউন্ড দেবে সে। শেষ পর্যায়ে আসবে সে পশ্চিম উপকূলের মাঝামাঝি জায়গায়। তারপর টপ করে কোন খাড়ি দিয়ে ঢুকে যাবে দ্বীপের মানচিত্র সে দেখেছে পশ্চিম উফকূলে বেশ কয়েকটি সুন্দর খাড়ি আছে। আহমদ মুসারি বিশ্বাস রস দ্বীপের এক সময়ের পণ্য গোডাউন ও সামরিক গোডাউনগুলো কোন খাড়ির তীরেই হবে।

আহমদ মুসা মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। গভর্নর বালাজী বাজীরাও-এর কথা যদি তারা ঠিত ধরে থাকে এবং স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনি যদি ঠিক বলে থাকে তাহলে ধ্বংস এলাকার কোন গোডাউনে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসার চিন্তায় ছেদ পড়ল।

একটা হেলিকপ্টারের শব্দে মুখ তুলল সে। দেখল, তার বাম দিক অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার ছুটে আসছে। ছোট হেলিকপ্টার। এ্যাকোমোডেশনের দিক থেকে ৬সিটের মাইক্রোর চেয়ে সুবিধাজনক হবে না।

হেলিকপ্টার কাছে চলে এসেছে। আবার মুখ তুলল আহমদ মুসা। এবার তার কারেছ স্পষ্ট হলো, হেলিকপ্টারটি কোন ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর। কিন্তু হেলিকপ্টারটি সোজা 'রস' দ্বীপের দিকে যাচ্ছে না। তার মাথার উপর দিয়ে

দক্ষিণমুখী তার গতি। আহমদ মুসা ভাবল, আরও দক্ষিণের, হয়তো নিকোবরের কোন দ্বীপ লক্ষ্য হতে পারে হেলিকপ্টারটির।

আহমদ মুসা হেলিকপ্টারটির চিন্তা বাদ দিয়ে চোখ নামিয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করল। হঠাৎ তার মনে হলো হেলিকপ্টারটি যেন তার মাথার উপর স্থির হয়ে আছে।

দেখার জন্য মুখ উপরে তুলল আহমদ মুসা। কিন্তু তাকিয়েই তার দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দেখল, হেলিকপ্টার থেকে সাদা এক গুচ্ছ সিল্কের কর্ড ধরনের কিছু নেমে এসেছে তার মাথার উপর। চিন্তা করার আগেই কর্ডের গুচ্ছটি তাকে এসে জড়িয়ে ধরল। সে যে ফাঁদে আটকা পড়েছে তা এবার বুঝতে বাকি রইল না আহমদ মুসার।

সিল্কের কর্ডটি একটা ম্যাগনেটিক ফাঁস। রিমোট কনট্রোরে মাধ্যমে ফোল্ড-আনফোল্ড করা যায়। সিল্কের কর্ডের গুচ্ছটি আহমদ মুসার দেহের উপর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নিশ্চয় হেলিকপ্টার থেকে রিমোট কনট্রোল অন করা হয়েছিল। চোখের মিনিষেই সিল্কের কর্ডগুলো গুটিয়ে গিয়ে আহমদ মুসাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। কোমর থেকে উপর দিকে দু'হাতসহ সবটাই অনড় বাঁধনের মধ্যে পড়ে গেল। হাত দু'টি তিলমাত্র নড়াবারও কোন উপায় ছিল না।

এরপর কি ঘটবে সেটার পরিস্কার আহমদ মুসার কাছে। ফাঁসটি এবার গুটিয়ে নেবে ওরা উপর থেকে। তুলে নেবে তারা তাকে হেলিকপ্টারে।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিরাই তাকে এই ফাঁদে আটকেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা তাকে চিনল কি করে? জানল কি করে যে সে 'রস' দ্বীপে এইভাবে যাত্রা করেছে? একবারে নিশ্চিত না হয়ে তারা এইভাবে হেলিকপ্টার নিয়ে আসেনি। 'রস' দ্বীপে আসার বোটও সে নিজে ঠিক করতে যায়নি। বোট ঠিক করেছে হাজী আবদুল্লাহ নিজে এবং সেই একমাত্র বিদায়কালে তাকে দেখেছে। বোট কোম্পানীর লোকরা হাজী আবদুল্লাকে সন্দেহ করেছিল? তারাই কি খবর দিয়েছে কাউকে? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল আহমদ মুসার মাথায়।

তাকে টেনে তোলা হলো হেলিকপ্টারে। আছড়ে ফেলা হলো তার দেহকে হেলিকপ্টারের মেঝের উপর।

আহমদ মুসা দেখল পাইলটসহ সাত সিটের হেলিকপ্টার। ভর্তি সবগুলো সিটই। তার মানে হেলিকপ্টারে লোকের সংখ্যাও সাতজন।

আহমদ মুসা সবার মুখের উপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিল। একজনের পরনে গেরুয়া বসনম, তার মাথায় পাগড়িও রংও গেরুয়া, সে মধ্যবয়ষী। পাইলটসহ অন্য সবাই যুবক এবং তাদের পরনে প্যান্ট-টিসার্ট, পায়ে কেড্স। মুখে সকলের তৃপ্তির হাসি।

আহমদ মুসার দিকেও ওরা কটমট করে তাকিয়েছিল। যুবকদের একজন বলে উঠল, 'এই আমেরিকান, আমেরিকার তো নয়।'

বলে উঠল আরেকজন, 'আজগুবি কথা বলিস না আমেরিকান হলেই আমেরিকার হয়ে যায়।'

'সত্যি আমেরিকান তো?' অন্য একজন বলল।

'না আমেরিকান। খোঁজ নেয়া হয়েছে।' বলল প্রথম যুবকটি।

একজন যুবক হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, স্বামীজী, ভাল করে দেখুন, আমরা হারবারতাবাদের 'শাহ্ বুরুজে'র সামনে সেদিন গঙ্গারামরে সাথে থাকা একজন লোকের যে বিবরণ যোগাড় করেছি তার সাথে এর চেহারা সম্পূর্ণ মিলে যায়।'

যুবকটি গেরুয়া বসনধারী কপালে তিলক আঁকা মাঝবয়সী লোকটাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলল। গেরুয়া বসনধারী লোকটিও আহমদ মুসার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল।

স্বামীজীর পুরো নাম স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনি। ইনি দৃশ্যত আন্দামানের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নামক এনজিও'র প্রধান, কিন্তু কাজ করেন তিনি গোপন সন্ত্রাসী আন্দোলনের সাথে।

আগের যুবকটির কথা শেষ হতেই আরেকজন যুবক কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু স্বামীজী তার কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'এবার তোমরা থাম।'

বলে সে একটু থামল। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখ দু'টি লাল আর বাজপাখির মত তীকষ্ন। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'তুমি কে? তুমি আমেরিকান নিশ্চয়, কিন্তু তুমি শুধু বিভেন বার্গম্যান নও।'

স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনীর গলা ঠান্ড, শান্ত। কথা শুনেই আহমদ মুসা বুঝল, এ লোকটি ওদের থেকে আলাদা। প্রফেসনাল অ্যাকটিভিষ্টে সে। হতে পারে নেতা গোছেরও কেউ। তাকে ধরার মিশনে একজন নেতা আসাই তো স্বাভাবিক।

'আপনারা কি পরিচয় সন্ধান করছেন?' বলল আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে।

আহমদ মুসার কথায় লোকটি ভ্রু-কুঞ্চিত করল। বিরক্তির প্রকাশ ঘটেছে তার চোখে-মুখে। বলল, 'আমরা কোন পরিচয় সন্ধান করছি না, আমরা জানতে চাচ্ছি তুমি কে?'

'কি পরিচয় জানতে চাচ্ছেন? নাম-ধামের বাইরের আরও কিছু পরিচয় আপনাদের ইমিগ্রেশন বিভাগ জানে । আপনাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'শাহবুরুজে আমাদের লোককে খুর করেছ, ভাইপার দ্বীপে আমাদের লোককে খুন করেছ, সেটাও কি আমাদের ইমিগ্রেশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানে?' স্বামীজীর কণ্ঠ এবার ধারাল।

'এ অভিযোগগুলো পুলিশের উত্থাপন করার কথা। পুলিশকে আপনাদের জানানোর কথা।

'পুলিশ তো তোমাকে পাচ্ছে না। সাহারা হোটেল থেকে তুমি পালিয়ে এসেছ।'

'পালিয়ে নয় সরে এসেছি দু'জন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার জন্য।'

'বিপদগ্রস্ত কারা? সাহারা বানু, শাহ্ বানু?'

'অবশ্যই।'

'ওদের সাথে বিভেন বার্গম্যানের কি সম্পর্ক?'

'মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে, এজন্যে সম্পর্কের প্রয়োজন হয় না।'

'তারা কোথায়?'

‘নিশ্চয় তারা অন্য কারো আশ্রয়ে আছে। আমি এখানে বিদেশী। আমার বাড়ি-ঘর নেই এখানে। কাউকে আশ্রয় দেবার প্রশ্ন ওঠে না।’

‘শাহবুরুজে ও হারবারতাবাদ-পোর্ট ব্লেয়ার রাস্তায় আমাদের লোকদের খুব করেছ সেটাও কি মানুষকে সাহায্য করার জন্য।’

‘অবশ্যই।’

‘শাহবুরুজে কেন গিয়েছিলে?’

‘একজন পর্যটক অনেক কিছুই দেখে। একজন প্রাচীন কয়েদীর বাসস্থান শাহবুরজে দেখতে গিয়েছিলাম। ঠিক তখনই কিডন্যাপ হচ্ছিল সাহারা বানু ও শাহ্ বানু।’

‘কোন পর্যটক এখানে রিভলবার-বন্দুক নিয়ে আসতে পারে না। তুমি রিভলবার সাথে এসেছিলে কেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে?’

‘আমি বন্দুক রিভলবার কিছুই আনিনি।’

‘কিন্তু আমাদের লোকদের তুমি রিভলবারে গুলীতে হত্যা করেছ।’

‘সেটা আমার রিভলবার নয়। ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া রিভলবার।’

‘একজন পর্যটক কি অমন পেশাদার বন্দুকবাজ হতে পারে?’

‘মার্কিন পুরুষ নাগরিকদের প্রত্যেকেরই একটি সৈনিক জীবন আছে। সৈনিকরা পেশাদার ক্রিমিনালদের চেয়ে অনেক দক্ষ বন্দুকবাজ।’

‘তুমি ভাইপার দ্বীপে আমাদের লোকদের খুন করেছ। গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে যাওয়া কি একজন মার্কিন পর্যটকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?’

’গঙ্গারাম আমার গাইড ছিল, বন্ধু ছিল।তার বিপদে এগিয়ে যাওয়া পর্যটক হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে আমারদ দায়িত্ব ছিল।’

‘দুনিয়াতে এমন পর্যটক কিংবা মানুষ কি কোথাও আছে, যে বিদেশে গিয়ে স্বল্প পরিচিত এক মাত্র গাইডের উদ্ধারের জন্যে ডজনেরও বেশি লোক হত্যা করত পারে?’

‘অবশ্যই যেতে পারে। কারণ হত্যা এখানে বিষয় নয়, বিষয় ছিল গঙ্গারামকে উদ্ধার করা। উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে আপতিত ঘটনায় ডজন

খানেকের মত লেঅক নিহত হয়েছে। পর্যটকও হতে পারতো। নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই আক্রমণকারীদের হত্যা করতে হয়েছে। পর্যটক ওদের হত্যা করতে যায়নি, গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে.........।' আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না।

স্বামী স্বরূপানন্দ মহামুনি বিদ্যুৎ বেগে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ দু'টি আরও লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। সে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথেই তার ডান পায়ের প্রচণ্ড এক লাথি গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার মুখে।

মুখটা সরিয়ে নেয়ায় লাথিটা গিয়ে আঘাত করেছে চোখের ঠিক পাশটায়। থেতলে গেল জায়গাটা। গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত।

রক্তের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে কথার রাজ্যের শ্লেষ ছড়িয়ে বলল, 'উকিলের মত আরগুমেন্ট পেশ করছো। তোমাকে ওকালতির জন্য আনা হয়নি, আনা হয়েছে হিসাব-নিকাশ শেষ করার জন্যে।'

স্বামী স্বরূপানন্দ ফিরে এল তার আসনে। একটু সামনে ঝুঁকে বসে বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'এবাল বল 'রস' দ্বীপে কেন যাচ্ছিলে?'

রক্ত গড়িয়ে পড়েছে চোখের কোণ থেকে। হাত দু'টি আহমদ মুসার ফাঁসের মধ্যে বাঁধা থাকায় রক্ত মুছে ফেলার আর সুযোগ নেই।

উঠে বসল আহমদ মুসা। হাসল। বলল, 'সবাই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে 'রস' দ্বীপে যায় না।' শান্তকণ্ঠ আহমদ মুসার।

'আবার ওকালতির ভাষা শুরু করেছো।' চিৎকার করে বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।একটু থামল সে। থেমেই আবার বলে উঠল, 'কথা না বললেই বেঁচে যাবে তা নয়। এটা থানা পুলিশ নয়, কথা বের করে ছাড়ব। আর হাজী আবদুল্লাকেও ছাড়া হবে না। হাতে নাতে তাকে আমরা ধরব, তারপর সব বেরিয়ে আসেবে।'

স্বামীজী থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'তোমরা থানা-পুলিশ নও, তাহলে কে তোমরা? আমাকে এভাবে ধরার, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার তোমাদের কি অধিকার আছে।'

‘আমরা কে? আমরা তোমাদের বাপ, তোমাদের দাদার বাপ, পরদাদার বাপ।’

‘আন্দামানে আমেরিকানদের বাপ এল কি করে?’

‘আহমদ শাহ্ আলমগীর, সাহারা বানুরা আমেরিকান নয়।’

‘তাদের বাপ হলে কি করে? তারা তো মুসলমান। তাদের দাদা-পরদাদারা হিন্দু ছিল বলেই কি বলছেন?’

‘তোমার এসব ওয়াজ রাখ। বল তুমি ‘রস’ দ্বীপে কেন যাচ্ছিলে? কি জানতে পেরেছ সেখানকার?’

‘তাহলে ওখানে জানার মত বড় কিছু আছে?’ ঠাণ্ডা গলায় বলল।

চোখ দু’টি জ্বলে উঠল স্বামীজীর। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এগুতে গেল আহমদ মুসার দিকে।

ঠিক এস সময় হেলিকপ্টার একটা ড্রাইভ দিল। পাইলট বলে উঠল, গুরুজী আমরা এসে গেছি। আমি চত্বরে ল্যান্ড করব? ওদিকে কিছু পুলিশ দেখা যাচ্ছে।’

স্বামী স্বরূপানন্দ এক ধাপ পিছিয়ে এসে বসে পড়ল সিটে। বলল, ‘পুলিশ তো কি হয়েছে। ওদরে বাবার লোক আমরা। নেমে যাও। এখানকার থানা-পুলিশের সবাই আমাদের চেনে। চিন্তা নেই। এই শয়তান আমেরিকানকে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া যাবে।’

স্বামী স্বরূপানন্দ থামতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, ‘তোমাদের পুলিশের এই বাবা পুলিশ না তোমাদের মত কোন ক্রিমিনাল।’

আগুনের মত জ্বলে ওঠা চোখ নিয়ে তাকাল স্বামী স্বরূপানন্দ আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘শয়তান আমরা ক্রিমিনাল নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমরা দেশকে অপবিত্রদের স্পর্শ থেকে মুক্ত করতে চাই। আর তাকে ক্রিমিনাল বলছ? তিনি শুধু পুলিশের মালিক নন, আন্দামানেরও মালিক।’

আহমদ মুসার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। বলল, আন্দামানের মালিক তো গভর্নরকে বলা যাযা এক হিসেবে।’

হুংকার দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল স্বামী স্বরূপানন্দ। বলল, ‘আমি গভর্নরের নাম বলেছি? হারামজাদার মুখ ভেঙ্গে দেব। তুই কি কাঠের তৈরী? এতবড় লঅথি খাওয়ার পরও বকবক করছিস। ভয় নেই তোর শরীরে?’

বন্যার বেগের মত কথাগুলো উদগীররণ করেই স্বামী স্বরূপানন্দ বসে পড়ল। বসে বসতে বলল, ‘চল দেখাচ্ছি মজা।’

স্বরূপানন্দের কথাগুলো আহমদমুসার কানে খুব কমই প্রবেশ করেছে। সে ভাবছিল অন্য কথা। স্বয়ং গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধব এই সন্ত্রাসী দলের নেতা, এটাই কি তাহলে সত্য?

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হেলিকপ্টার থেমে গেল।

ল্যান্ড করেছে হেলিকপ্টার।

আহমদ মুসা মুখ ঘুরাল চারদিকটা দেখার জন্যে।

‘শয়তানকে এখন ক্লোরোফরম করনি। তাড়াতাগি করে।’ চিৎকার করে উঠল স্বামী স্বারূপানন্দ।

পর মুহূর্তেই একজন ছুটে এল। একটা টিউবের ছিপি খুলে সে আহমদ মুসার নাকের ফুটোয় গুঁজে দিল।

আহমদ মুসা বুঝল ওটা ক্লোরোফরম। একটু হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। সে চোখ বুঝল। পরমহূর্তেই তার দেহ টলে উঠে পড়ে গেল হেলিকপ্টারের মেঝের উপর।

পনের বিশ সেকেন্ডের বেশি ধরে থাকতে হলো না আহমদ মুসার নাকে।

‘বড় বড় কথা বলে, কিন্তু এত অল্প সময়ে কাবু? যাও, তোমরা শয়তানটার সংঙ্গাহীন দেহ ষ্ট্রেচারে নাও।’ বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।

দু’জন ছুটে এসে আহমদ মুসার দেহ দরজার পাশে রাখা ষ্ট্রেচারের দিকে টেনে নিতে লাগল।

ষ্ট্রেচার থেকে আহমদ মুসাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ওরা মেঝের উপর।

মেঝের উপর আছড়ে পড়েছিল আহমদ মুসার দেহটা। মেঝের সাথে ঠুকে গিয়েছিল চোখের কোণের আহত জায়গাটা আবার। আহত জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। হাত বাঁধা থাকার জন্যে আগে যেমন আহম জায়গায় হাত বুলাতে পারেনি, এখনও তেমনি সংজ্ঞাহীন থাকার ভান করার কারণে আহত জায়গায় হাত বুলাতে পারেনি, কিংবা আহত স্থানটাকে আরাম দেয়ার জন্যে দেহটাকে পাশ ফেরানোও সম্ভব হয়নি।

ওরা বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেই মুখ থুবড়ো পড়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে শয়ন করলে আহমদ মুসা। চোখ বুজে কয়েকটা বড় শ্বাস নিয়ে আহমদ মুসা ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

মাথা ঘুরিয়ে নিল চারদিকটায়। বড় একটা ঘর।

দু'দিকে আড়াআড়ি দু'টি দরজা। কোন জানালা নেই। অনেক উপরে ভেন্টিলেশনের জন্যে ঘুলঘুলি রয়েছে।

কক্ষটি ষ্টোর রূম হিসাবে ব্যবহৃত হয় আহমদ মুসা অনুমান করল।

আহমদ মুসা উঠে বসার কথা চিন্তা করল। কিন্তু পরক্ষণেই বাবল, ঘরে যদি টিভি ক্যামেরা থাকে? তাহলে তো এখনি ওদের কাছে খবর হয়ে যাবে যে, আমি উঠে বসেছি, আমার জ্ঞান ফিরেছে। এত তাড়াতাড়ি কোনভাবেই সংজ্ঞা ফেরার কথা নয়। তখন তারা ভাবতে পারে আমি সংজ্ঞাহীনের ভান করেছিলাম। সেক্ষেত্রে তারা আমার ব্যাপারে আরও সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু তার মনে পড়ল, তাকে এই বাড়িতে প্রবেশ করানোর সময় স্বামী স্বরূপানন্দ বলেছিল, 'এ পর্যন্ত বুঝা গেছে এ লোকটা সাংঘাতিক ধড়িবাজ। এক আপাতত ষ্টোরেই আটকে রাখা হোক। জানালা নেই, সুবিধা হবে। দরজায় পাহারা বসিয়ে রাখলেই চলতে।' তার কথা শেষ হতেই আরেকজন বলে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গেই, 'কিন্তু জানালা থাকলে নজর রাখা যেত। সেটা ভালো হতো না?' উত্তরে স্বরূপানন্দ বলেছিল, 'কেন উত্তরের দরজায় তো 'আই-হোল' আছে। আর সংজ্ঞাহীনদের উপর আবার কি দৃষ্টি রাখবে। আর বেশি সময় তো থাকছে না। মিঃ কোলম্যান এলেই তো আমরা এর একটা বিহিত করবো।' একথাগুলো থেকেই পরিস্বার বুঝল আহমদ মুসা যে, এই ঘরে পর্যবেক্ষণের জন্যে কোনো টিভি ক্যামেরা নেই।

খুশি হলো আহমদ মুসা। উঠে বসল সে।

কোনও দিক থেকে কথার রেশ ছুটে আসতে শুরু করল এই সময়। কান খাড়া করল আহমদ মুসা।

খুবই ক্ষীণ, জড়ানো আওয়াজ। কিছুই বুঝতে পারল না আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল সে।

আরেকটু কান পেতে শুনল। তারপর ধীরে ধীরে এগুলো আহমদ মুসা উত্তর দিকের দরজাটার দিকে। ঐ দিক থেকেই শব্দটা আসছে। আহমদ মুসাকে এই দরজা দিয়েই প্রবেশ করানো হয়েছিল, দেখেছে আহমদ মুসা। আর এ দরজাতেই 'আই হোল' আছে।

দরজার সামনে দাঁড়াল আহম মুসা। শব্দ বড় হয়েছে, খুব স্পষ্ট এখনও নয়।

মুখ এগিয়ে নিয়ে সে সন্তর্পণে চোখ নিল আইহোলের কাছে।

আইহোলের মুখের সাটারটি খোলা ছিল। চমকে উঠেছিল আহমদ মুসা। ওপার থেকে কেউ চোখ রাখেনি তো ঘরে?

কিন্তু চোখ দু'টি আইহোলের সোজাসুজি এগিয়ে এসে দেখল ওপারে ফাঁকা, আলো দেখা যাচ্ছে।

আরেকটা ভুল ভাঙল আহমদ মুসার। ওটা আইহোল নয়। নিছকই একটা গোলাকার ফুটো। দু'পার থেকেই দেখা যায়। এ কারণেই বোধ হয় সাটার লাগানানোর ব্যবস্থা।

বাইরে থেবে বেসে আসা কথা এবার অনেক স্পষ্ট। কথার মধ্যে একটা পরিচিত কণ্ঠ পেল আহমদ মুসা। কোলম্যান কোহেন তাহলে এসে গেছে। ইসরাইলের গোয়েন্দাসংস্থা 'মোসাদ'-এর সবচেয়ে সফল গোয়েন্দা হলো ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেন। আন্দামানে সে এসেছে ভারতে একটা বড় সন্ত্রাসী গ্রুপকে সাহায্য করার জন্যে। হাজী আব্দুল্লাহ আলীর কাছে আহমদ মুসা এই কথা শুনেছিল। এরাও বলেছিল কোলম্যান কোহেনের এখানে আসার কথা। না হলে এত তাড়াতাড়ি তার কণ্ঠ হয়তো সে ধরে ফেলতো পারতো না।

উৎকর্ণ হয়েছে আহমদ মুসা। দরজার ফুটো দিয়ে তার চোখ দু'টোও ওদের সন্ধান করছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে পড়ল ওরা।

ওরা ডান পাশে ওদিকের একটা দরজারর সামনে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

স্বামী স্বরূপানন্দ ও ক্রিষ্টেফার কোলম্যান কোহেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এপাশ থেকে দু'জনকেই মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

কথা বলছিল কোলম্যান কোহেনই। সে বলছিল, '........ ওসব কথা সবই শুনেছি, কিন্তু কি বললেন লোকটি দেখতে এশিয়ান? এশিয়ান মানে কোন দেশের মত?'

'তুর্কি বা আরব অঞ্চলের মত।' বলল স্বামী স্বরূপানন্দ।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো কোলম্যান কোহেনের। অনেকটা স্বগতঃকণ্ঠে বলল, 'তুর্কিদের চেহারা , তার সাথে আমেরিকান পাসপোর্ট।' দৃষ্টিটা একটু নিচু, কিচুটা আত্মস্থভাব কোলম্যান কোহেনের।

'ঠিক আছে, চলুন দেখবেন। অবশ্য সে এখনও সংজ্ঞাহীন।' স্বামী স্বরূপানন্দ বলল।

'চলুন যাওয়া যাক। আমি যার কথা ভাবছি সে নিশ্চয় নয়। তাকে এভাবে আপনারা পাকড়াও করতে পারতেন না। সে শৃগালের মত ধড়িবাজ, আর সিংহের মত হিংস্র।'

'কিন্তু এও কম যায় না মিঃ কোলম্যান। আমরা যখন ক্রোধে ফেটে যাচ্ছি, ওকে আঘাত করছি, তখনও তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই, একদম পাথরের মত ঠাণ্ডা সে।' বলল স্বামী স্বরূপানন্দ স্বামীজী।

'এমন ক্রিমিনাল বহু আছে স্বামীজী। বলে মুহূর্তকাল থামল কোলম্যান কোহেন। পরে বলে উঠল, 'তবে সে যদি হয়, তাহলে দেখা মাত্র গুলী করব। অতীতে ভুল করেছি, আর করব না।' কোলম্যান কোহেন বলল।

'কেন, কেন, গুলী কেন? তাকে তো এইমাত্র ধরা হল। কিছুই জানাই হয়নি তার কাছ থেকে।' বলল স্বামীজী দ্রুত কণ্ঠে।

'আমি যার কথা ভাবছি সে যদি হয়, তাহলে তার কাছ থেকে একটা কথাও আদায় করা যাবে না। সে ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না, এটা শত-সহস্রবার প্রমাণ হয়ে গেছে। তাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই।'

'কিন্তু মারলেই বা লাভ কি?'

'সে পালাতে পারবে না, আমাদের ক্ষতি করার আর তা সুযোগ থাকবে না।'

'পালাবে কেন? আমরা পালাতে দেব কেন? আমাদের হাত থেকে কেউ এখনো পালাতে পারেনি।'

'সে পারবে। সে মানুষ নয়, একেবারে অতিমানুষ। আমরা বহুবার ঠকেছি। আর ঠকার সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। টুইন টাওয়ারের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকায় যা ঘটল, এরপর আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছেম তাকে দেখা মাত্র গুলী করার। তাকে দেখার পর একটা শব্দ উচ্চারণের মতও সময় নষ্ট করা যাবে না। চোখে পড়ার সাথে সাথেই তাকে গুলী করতে হবে। তাকে হত্যা করার মধ্যেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান।'

বলে একটু থেকে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠলম '‌ও যে একাই একটা বোট নিয়ে 'রস' দ্বীপে যাচ্ছে, এটা টের পেলেন কি করে আপনারা? আর সে সন্দেহজনক মনে হলো কি করে?'

'আমাদের চোখ ছিল হাজী আব্দুল্লাহ আলীর উপর। সেই -ই বিভেন বার্গম্যানকে ট্যুরিষ্ট অফিসে নিয়ে গেছে এবং 'রস' দ্বীপে যাবার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এইভাবে হাজী আব্দুল্লাহর উপর চোখ রাখতে গিয়ে হোটেল সাহারা থেকে নিখোঁজ হওয়অ সন্দেহের একটা বড় লক্ষ্য বিভেন বার্গম্যানকে আমরা পেয়ে যাই। তার 'রস' দ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগে তার প্রতি আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভুত হয়। একদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরের পরিবারে সাথে তার সম্পর্ক থাকা, অন্যদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরকে বন্দী করে রাখা 'রস' দ্বীপে তার যাওয়ার সিদ্ধান্তে পরিস্কার হয়ে যায়, 'রস' দ্বীপে তার মিশন কি। তার উপর ট্যুরিষ্ট অফিস থেকে সে 'রস' দ্বীপের পুরানো মাত্রচিত্র যোগাড় করেছে সে যাবে দ্বীপের বাড়িঘর, গোডাউন, অফিস-আদালত, ইত্যাদিরর সুস্পষ্ট অবস্থান নির্দেশ করা

আভে। এই ম্যাপ এখন নিষিদ্ধ ট্যুরিষ্ট বা সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু তার কাছে আমিরিকান বিশেষ পাসপোর্ট থাকায় সে এর প্রভাব খাটিয়ে উপরের অফিসারের কাছ থেকে মানচিত্রটা যোগাড় করেছে। এ খবর পাওয়ার পরই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, তাকে যে কোন মূল্যে ধরতে হবে।'

'বস কি সব জানেন?' বলল কোলম্যান কোহেন।

'বিবি মাধব?'

'হ্যাঁ।'

'তার গোয়েন্দারাইতো প্রথম জানতে পারেন এবং আমাদের জানান। তাঁর নির্দেশেই তো দ্রুত হেলিকপ্টারটার যোগাড় হয়েছে।'

'চলুন যাওয়া যাক।' বলে আহমদ মুসার বন্দীখানার দরজার দিখে মুখ ফিরাল কোলম্যান কোহেন।

'চলুন, কিন্তু বন্দী সম্পর্কে যে কথা বললেন, তার কি হবে? বসকে এ ব্যাপারে জানানো হয়নি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'বন্দী যদি আপনাদের সেই লোক হন, তাহলে তাকে দেখা মাত্র হত্যা করবেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কেন এটা তাঁকে জানানো দরকার? সে লোক আমাদের শিকার। আমরা তাকে শিকার করব।'

'এমন সাংঘাতিক শিকার লোকটি কে, যাকে হত্যাই আপনাদের নিরাপত্তার একমাত্র পথ?'

'আপনারাও চেনেন, সে আহমদ মুসা।'

নামটা শুনে চমকে উঠে স্বামীজী মুখ তুল কোলম্যান কোহেনের দিকে। কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থাকল কোহেনের দিকে। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে তার মুখ।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ বলে উঠল, 'সর্বনাশ! আহমদমুসা আমাদের দ্বীপের ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। যদি সত্যি হয় আমাদেরও দ্বিমত নেই আপনার সাথে। আমরা চাই না আমাদের দ্বীপপুঞ্জে

আহমদ মুসাপর অস্তিত্ব এক মুহূর্তেও থাকুক। সে শুধুই বিপজ্জনক নয়, সে মুসলিম কমিউনিটির বিজয়ের এবং উত্থানের 'পরশ পাথর।'

'ধন্যবাদ মিঃ স্বরূপনান্দ।'

উভয়ে পাশাপাশি এগিয়ে বলল আহমদ মুসার বন্দীখানার দরজার দিকে।

দরজার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধভাবে আহমদ মুসা শুনছিল তাদের কথা।

ওদের দরজার দিকে আসতে দেখে দ্রুত পেছনে সরে এল।

ইহুদী গোয়েন্দা ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেনের কথা শোনার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আহমদ মুস। আক্রমণে না গিয়ে উপায় নেই। আক্রমণে না গেলে তাকে আক্রান্ত হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সুবিধাটা তাদের হাতেই তুলে দেয়া হবে।

পেছনে সরে এসেই ভাবল আহমদ মুসা, দরজার একপাশে লুকোলেই সুবিধা বেশি হয়।

সেদিকে যাবার জন্য পা তুলতে গিয়ে আহমদ মুসার মনে হলো, ওরা দরজা খোলার আগে নিশ্চয় দরজার ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার দখেকে নেবে। যদি তারা আহমদ মুসাকে মেঝেতে আগের মত না দেখে তাহলে সাবধান হবে যাবে। ওদেরকে অসাবধান রেখে আক্রমণে যাওয়া বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে, যদিও এতে ঝুঁকি আছে।

আহমদ মুসা এ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করল। আহমদ মুসা আগের সেই সংজ্ঞাহীন অবস্থার মত শুয়ে পড়ল গিযে মেঝেতে।

আহমদ মুসা ঠিকই চিন্তা করেছিল। স্বামী স্বরূপানন্দ দরজার সামনে এসেই প্রথমে গিয়ে চোখ রাখল দরজার ফুটোয়। ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে ক্রিষ্টোফার কোলম্যান কোহেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'না মিঃ কোহেন ওর সংজ্ঞা এখনও ফেরেনি। দেখবেন?' বলে দরজা থেকে সারে এল স্বামী স্বরূপানন্দ।

কোলম্যান কোহেন গিয়ে ফুটোয় চোখ লাগাল।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দরজার ফুটো থেকে মুখ সরিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দের দিকে চেয়ে বলল, 'সে ওপাশ ফিরে আছে। চেনা যাচ্ছে না। চলুন ভেতরে।'

স্বামী স্বরূপানন্দ দরজায় পাহারত ষ্টেনগানধারী চারজনের একজনকে বলল, 'গনেজ দরজা খুলে দাও।'

দরজা খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল আগে স্বামী স্বরূপানন্দ। তারপর ক্রিষ্টোফর কোলম্যান কোহেন। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল ষ্টেনগানধারী সেই চারজন প্রহরী।

দরজা থেকে একটু সামনে এগিয়ে স্বামী স্বরূপানন্দ দাঁড়াল। তার পাশে দাঁড়াল কোলম্যান কোহেন।

দাঁড়িয়েই স্বামী স্বরূপানন্দ বলে উঠল, 'গনেশ যাও শয়তানটার মুখ এগিয়ে ঘুরিয়ে দাও।'

গনেশ নামক লোকটা ছুটল আহমদ মুসার দিকে।

সে গিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসার ওপাশে, তার মুখোমুখি। সে হাতের ষ্টেনগানটা মেঝেতে রেখে দু'হাত বাড়িয়ে আহমদ মুসাকে ঠেলে পাশ ফেরাতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভেলকিবাজির'র মতই ঘটে গেল ঘটনাটা।

মেঝেয় রাখা ষ্টেনগানটা আহমদ মুসার মুখের কাছ থেকে মাত্র ফুট দেড়েক দূরে ছিল।

আহমদ মুসার দু'হাত ছুটে গেল সেদিকে। ষ্টেনগানটি দু'হাতে ধরেই চোখের পলকে পাশ ফিরল কোহেনদের দিকে। সেই সাথে ষ্টেনগান থেকে গুলীর স্রোত ছুটে গেল সেদিকে।

আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আকস্মিকতার ধাক্কায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দ্রুত সামলে উঠেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর। তার লক্ষ্য আহমদ মুসার হাতের ষ্টেনগান।

লোকটার গোটা দেহই আড়াআড়িভাবে আহমদ মুসার উপর। আর তার দু'টি হাত গিয়ে চেপে ধরেছে আহমদ মুসার হাতের ষ্টেনগান।

লোকটি ষ্টেনগান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় নিজের দেহটাকে সামনে সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল।

লোকটি তখনও দু’পায়ের উপর শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। হ্যাঁচকা টানে তার দেহত কুণ্ডলি পাকিয়ে পড়ে গলে। তার হাত থেকেও ষ্টেনগান ফশকে বেরিয়ে গেল। ষ্টেনগান টেনে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা। লোকটিও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ষ্টেনগান দিয়ে আঘাত করল লোকটির কানের পাশটায়।

পাক খেয়ে তার দেহ ঝরে পড়ল মেঝের উপর। আহমদ মুসা তাকাল দরজার দিকে। ওদের পাঁচটি দেহই মেঝেতে লুটিপুটি খচ্ছে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে, আবার কেউ আহত।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল কোলম্যান কোহেনের দিকে। বুকে, পেটে সে গুলীবিদ্ধ। কিন্তু তখনও বেঁচে আছে। তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলভার তুলে নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, স্যরি মিষ্টার কোহেন, তোমরা দেখামাত্র গুলীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে বলে আমাকেও নিতে হয়েছে। তা না হলে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতাম, বলার ছিল।

চোখ খুলেই ছিল কোলম্যান কোহেন। বলল বাধো বাধো গলায়, ‘তুমি আন্দামানে জানলে আমি আরও সাবধান হতাম। গতকালই মাত্র আমরা জানতে পেরেছি, তুমি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সুপারিশে বিশেষ মার্কিন পাসপোর্ট ও বিশেষ ইন্ডিয়ান ভিসা পেছেছ।’

‘বুঝলে মিঃ কোহেন, সিআইএ-মোসাদ আতাতের পতন শুরু হয়েছে। দুঃখ যে, শেষটা হয়তো তুমি দেখে যেতে পারবে না।’

‘দিন কারো সমান যায় না আহমদ মুসা। কিন্তু দিন আবার ফেরেও।’

‘দিন আমাদের ফিরছে।’ বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুমি আমাকে টকেটা সাহায্য করতে পর, আহমদ শাহ্ আলমগীরকে তোমরা কোথায় রেখেছ বল?’

‘মনে করেছ যে, মৃত্যু আসন্ন জেনে উদার হয়ে তোমার শেষ একটা প্রার্থনা আমি পুরণ করব। না, আমি মরার আগে মরতে চাই না।’

ঠিক এ সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ও হৈ চৈ শোনা গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাতের ষ্টেনগানটা কাঁধে ফেলে আরেকটা ষ্টেনগান কুড়িয়ে নিল।

'আমাকে মেরে গেলে না আহমদ মুসা? মেরে ফেলে যাও।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল কোলম্যান কোহেন।

'তোমাকে মারা আমার মিশন নয়। তোমাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছি। তা করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাকে মৃত্যু দিবেন।' বলে আহমদ মুসা ছুটল দরজার দিকে।

দরজার পরেই একটা প্রশস্ত করিডোর। করিডোরটি পূর্বদিকে এগিয়ে উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে একটা বড় দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এটাই বাইরে বেরুবার দরজা। ওরা এদিক দিয়েই আহমদ মুসাকে বন্দীখানায় নিয়ে এসেছিল।

করিডোরে বেরিয়ে দেখল, চার-পাঁচজন লোক এদিকে আসছে। ওদের হাতের ষ্টেনগানগুলোর ব্যারেল নিচ দিকে নামানো। তাদের চোখে-মুখে কৌতুহলের চিহ্ন। আহমদ মুসা বুঝল এখানে কি ঘটেছে ওরা জান না।

কিন্তু আহমদ মুসাকে দেখে মুহূর্তেই মুখের ভাব পাল্টে গেল। ফুটে উঠল ক্রোধ ও লড়াকু ভাব। ওরা ষ্টেনগান তুলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা ওদের লক্ষ্যে ছোট এক পশলা গুলী করে বলল, 'শোন ষ্টেনগান তুলতে পারবে না। তার আগে সবাই মারা পড়বে। আমি খুনোখুনি চাই না। বাঁচতে চাইলে ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে হাত উপরে তুলে সবাই বাইরে চল।'

মাটি ছুয়ে যাওয়া ছোট্ট এক পশলা গুলীতেই কয়েকজন আহমদ হয়েছিল। ভয় ওদের চোখে-মুখে। ওরা আহমদ মুসার নির্দেশ পালন করল। ষ্টেনগান ফেলে দিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগল।

গেটের বাইরে চত্বরে কয়েকটি জীপ ও একটি মাইক্রো দাঁড়িয়েছিল। একটা জীব ছিল দরজার সামনেই।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। তার চোখ ঘুরে বামপ্রান্তে পৌছার আগেই কটা রিভলবার গর্জন করে উঠল এবং একটা গুলী এসে বিদ্ধ করল তার বাম বাহুকে।

আহমদ মুসার চোখ তখন পৌঁছে গেছে সেদিকে। সে জীপটার বাম পাশ দিয়ে দেখল একটা গাছের ছায়ায় চারজন লোক। তাদের পেছনে চারটা চেয়ার। তাদেরই একজনের হাকে রিভলবার। তখনও উদ্ধত। অন্য তিনজনও রিভলবার হাতে তুলে নিয়েছে।

আহমদ মুসার ষ্টেনগানও ছিল উদ্ধত। ট্রিগারে ছিল আঙুল। ওরা ও ওদের উদ্ধত রিভলার চোখে পড়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার তর্জনি ট্রিগার চেপে ধরছে।

বাহুর উপর আছড়ে পড়া গুলী নিঃসাড় করে দিয়েছে হাঁতটা। ঠেলে দিতে চাচ্ছিল দেহটাকে পেছনের দিকে।

কিন্তু আহমদ মুসা মুহূর্তেই হজম করে নিয়েছে আঘাতকে। বাম হাতটা দারুণ কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু ষ্টেনগান ছাড়েনি। আর ডান হাতের তর্জুনি আঘাতের এক শক-ওয়েভে কেঁপে উঠলেও আরও শক্তা করে ট্রিগার চেপে ধরেছিল।

ষ্টেনগান থেকে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃদ্ধি গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো চারজনকেই গিয়ে গ্রাস করল। ওদের কারো রিভলবার থেকেই আর গুলী আসার সুযোগ হয়নি। ঝরে পড়ল মাটিতে ওদের চারটি দেহই।

আহমদ মুসা ওদের পেছনে আর সময় ব্যয় না করে দ্রুত গিয়ে জীপে উঠল। আনকোরা নতুন জীপ। কী হোলে চাবি ঝুলছিল।

খুশি হলো আহমদ মুসা।

ষ্টেনগান পাশে রেখে, বাম হাতটাকে টেনে ষ্টিয়ারিং হুইলে নিয়ে ডান হাতে ষ্টার্ট দিল গাড়ি।

গাড়ি ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। রাস্তা ধরে ছুটে চলল তার গাড়ি। কোনদিকে কোথায় সে যাচ্ছে জানে না। জায়গার নাম কি তার জানা নেই। হেলিকপ্টারটি তাকে নিয়ে উত্তরদিকে এসেছে, এটুকু সে বুঝেছে। কিন্তু হেলিকপ্টারটি কোথায় ল্যান্ড করল, তা সে বুঝেনি। তবে হেলিকপ্টার যে গতিতে চলেছে, যতটা সময় নিয়েছে, তাতে অন্তত একশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে বলা যায়। তাতে আহমদ মুসার উত্তর আন্দামানের মায়া বন্দর, পাহলাগাঁও-এর মত কোন স্থানে রয়েছে।

ছুটে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

অন্ধের মত চলছে আহমদ মুসা। এই চলার ক্ষেত্রে তার এখন একটাই নীতিঃ অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায়।

প্রশস্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। সূর্যের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বুঝল সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে।

তীরর মত সোজা রাস্তা।

আহমদ মুসা গাড়ির রিয়ার ভিউ মিররে কয়েকটি গাড়ির ছবি ভেসে উঠতে দেখল।

এ পর্যন্ত রাস্তায় কোন গাড়ির সাক্ষাত পায়নি আহমদ মুসা। প্রথমবার দেখা মিলল, তাও একসাথে তিনটি।

রিয়ারভিউ-এ চোখ রাখল আহমদ মুসা। তিনটি গাড়িই তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে এবং তিনটি গাড়ির একই গতি। তার মানে এক জোট হয়ে চলছে।

এই শেষ চিন্তাটা তার মাথায় আসার সাথে সাথে আহমদ মুসার কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে গাড়িগুলো তার পেছনেই ছুটে আসবে।

আহমদ মুসা গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, কোথায় যাবে সে? মায়া বন্দর থেকে সে যদি বেরিয়ে থাকে, তাহলে সাময়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে পাহলাগাঁও। সেখানে পৌছা পর্যন্ত ডানে-বামে বেরুবার কোন পথ নেই। রাস্তার বামে সবুজ বনে আচ্ছাদিত পাহাড়, টিলার পর টিলা এগিয়ে গেছে দক্ষিণে। আর রাস্তার ডানে উত্তর দক্ষিণে বিলম্বিত উপত্যকাটা পশ্চিমে আরও কিছুটা প্রশস্ত। ঘন বনে ঠাসা এই উপত্যকায় কোন পথ ঘাটের কথা কল্পনাই করা যায় না, তবে এই উপপত্যকা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে গেছে দক্ষিণে। মানচিত্রে পাওয়া এটুকু তথ্যই তার মুখস্ত আছে, আর কিছু নয়।

কিন্তু পেছনের ওদের এড়িয়ে পাহলাগাঁও পৌছা কি সম্ভব হবে?

গাড়ির দিকে মনোযোগ দিল আহমদ মুসা। স্পিডমিটাররে কাঁটা আরও এক ধাপ উপরে উঠল, সোজা ও মসুণ হলেও রাস্তায় চড়াই-উৎরায় থাকায় এর বেশি স্পিড নিরাপদ নয়। আর তার গুলীবিদ্ধ বাম হাতটা খুব সক্রিয় হতে পারছে না। এখনও রক্ত ঝরছে আহত স্থান থেকে। যন্ত্রণা বাড়ার সাথে সাথে হাতটা

ভারীও হয়ে উঠেছে। গুলীটা বেরিয়ে গেছে না ভেতরে আছে বুঝতে পারছে না আহমদ মুসা। এটা দেখারও তো এখন সুযোগ নেই।

আহমদ মুসা শুনতে পেল তার পেছনে হেলিকপ্টারের শব্দ। চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল, পেছন থেকে একটা হেলিকপ্টার ছুটে আসছে। স্বামী স্বরূপানন্দদের সেই হেলিকপ্টারই হবে, নিশ্চিত ধরে নিল আহমদ মুসা।

একেবারে নিচ দিয়ে উড়ে আসছে হেলিকপ্টারটা।

তাদের পরিকল্পনা পরিস্কার হলো আহমদ মুসার কাছে। হেলিকপ্টারটা সামনে গিয়ে রাস্তা ব্লক করবে, আর পেছন তেখে ছুটে আসবে গাড়ি। এভাবে ফাঁদে ফেলবে তারা আহমদ মুসাকে। অথবা হেলিকপ্টার থেকে তার গাড়ি লক্ষ্যে ওরা গোলা ছুড়তে পারে, আবার বোমা ফেলতেও পারে যদি কোলম্যান কোহেন জীবিত থাকে। আহমদ মুসার মৃত্যুই তো কোলম্যান কোহেনের একমাত্র চাওয়া।

ধেয়ে আসছে হেলিকপ্টারটা। পেছনের দিনটি গাড়ির সমান্তরালে গেছে। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই তার মাথার উপরে এসে যাবে হেলিকপ্টার।

আহমদ মুসার ডানে উপত্যকার দিকে ঘন জংগল। গাড়ি ত্যাগ না করে উপায় নেই আহমদ মুসার। আপাতত উপত্যকার ঘন জংগলে তাকে আশ্রয় নিতে হবে।

আহমদ মুসা গাড়িটাকে রাস্তার ডান ধারে নিল।

রাস্তার ধারটা ঢালু হয়ে উপত্যকার দিকে নেমে গেছে। ঢালটা ঘাশ ও আগাছায় ভরা, বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড়ও আছে। ঢাল কতটা গভীর আন্দাজ করতে পারছে না আহমদ মুসা।

রাস্তার ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে তার গাড়ি।

আহমদ মুসা ষ্টেয়ারিং হুইল লক করল যাচে চালকবিহীন অবস্থাতেও গাড়িটা কিছুপথ সামনে এগুতে পারে। রাস্তা সোজা হওয়ায় এ ব্যবস্থা চলবে কিছুটা পথ পর্যন্ত। আহমদ মুসা চায় সে কোথায় নেমেছে, এ ব্যাপারে ওদের বিভ্রান্ত করতে।

আহমদ মুসা পেছনের গাড়ি ও হেলিকপ্টারের অবস্থানটা আর একবার দেখে নিয়ে উপর থেকে বড় গাছ গাছড়ার আড়াল আছে এমন একটা স্থান পছন্দ করে দু'টি ষ্টেনগান ও গাড়িতে পাওয়া গুলীর বাক্সটা জংগলে ছুঁড়ে দিযে আহদ বামবাহুকে যতটা সম্ভব নিরাপদ রেখে ডানে কাত হয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল রাস্তার ঢালে একটা ঝোপের মধ্যে।

আহমদ মুসার দেহ যেখান ঝোপে পড়ল, ঢাল সেখানে খাড়া হওয়ায় দেহটা উল্টে পাল্টে একটা গাছের গোড়ায় লেগে গেল।

প্রচণ্ড ব্যাথা পেল আহমদ মুসা তার আহত বাম হাতটায়।

বাম বাহু চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে পড়ে থাকল।

ঐ পড়ে থাকা অবস্থাতেই শব্দ শুনে আহমদ মুসা বুঝল, প্রথমে হেলিকপ্টার, তারপর গাড়ি তিনটি তাকে অতিক্রম করে গেল।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে উঠল। সাপের মত নিঃশব্দে ক্রলিং করে ছুঁড়ে ফেলা অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিল।

আহমদ মুসা জংগলের ভেতর থেকে উজি দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তাকাল হেলিকপ্টার ও গাড়রি দিকে।

এই সময় ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হলো।

আহমদ মুসা দেখতে পেল, হেলিকপ্টার থেকে তার গাড়ি লক্ষ্যে গুলী করা হয়েছে।

হেলিকপ্টারটি আহমদ মুসার চালকহীন গাড়ি অতিক্রম করে সামনে গিয়ে রাস্তার কয়েক ফুট উপর পর্যন্ত নেমে গড়ির মুখোমুখি অবস্থানে স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

গুলীতে আহমদ মুসার গাড়ির সামনের দু'টি টায়ারই ফেটে গেছে। গাড়িটি রাস্তার উপর হুমড়ি খেযে পড়ে উল্টে গেছে।

পেছনের তিনটি গাড়ি সেখানে পৌঁছে গেল। হেলিকপ্টারও রাস্তায় ল্যান্ড করল।

গাড়িগুলো ও হেলিকপ্টার থেকে কয়েকজন ছুটে গেল আহমদ মুসার উল্টে যাওয়া গাড়ির দিকে।

সবাই দাঁড়াল গাড়ির পাশে। সবারই হাতে উদ্যত ষ্টেনগান।

ওদের মধ্যে থেকে দু'জন ছুটে গিয়ে গাড়ির ভেতরটা দেখতে লাগল। কাত হয়ে থাকা গাড়িটা সব দিকে থেকে পরীক্ষা করে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন চিৎকার করে কিছু বলল সবার উদ্দেশ্যে।

আহমদ মুসা বুঝল, গাড়িতে তাকে না পাবার কথাই বলা হচ্ছে। নিশ্চয় বলেছে, আহমদ মুসা গাড়িতে নেই, তার লাশও নেই।

অবশিষ্টরাও ছুটে গেল গাড়ির কাছে। গাড়িটাকে ঠেলে সোজা করে হলো।

গাড়ি পরীক্ষা করার পর সবাই গাড়ি থেকে সরে এল এবং তাদের দৃষ্টি ইতস্তত বাইরে ঘুরতে শুরু করল।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসা গলায় গেরুয়া চাদর ঝুলানো দীর্ঘকায় একজন লোক সবাইকে ডেকে কিছু কথা বলল এবং হাত নেড়ে রাস্তার পশ্চিম পাশের উপত্যকা এলাকার দিকে ইংগিত করল।

সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছুটল হেলিকপ্টারের দিকে। তারা হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে আনল একটা বাক্স। বাক্স থেকে এক এক করে সবাই হাতে নিল টিয়ার গ্যাস গান ধরনের বন্দুক। তার সাথে সবাই একটা করে হাতে নিল লাল রং-এর ঝোলানো থলে ওয়ালা বেল্ট।

ভ্রুকঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

ওরা কি টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বে? কিন্তু টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে কি হবে? টিয়ার গ্যাস তো মানুষকে ছত্রভঙ্গ করা, পালিয়ে দেরার জন্যে, কাউকে ধরার জন্যে নয়। কিন্তু ওরা তো তাকে ধরতে চায়।

লোকগুলো বেল্ট কোমরে বেঁধে হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটে আসবে। ওরা রাস্তার পশ্চিম ধার বরাবর বেশ দূরে দূরে অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আহমদ মুসা বুঝল ওরা জংগলে ঢুকবে না। রাস্তা থেকে টিয়ার গ্যাস শেল ছুড়বে।

ব্যাপর কি বুঝতে না পেরে অতিসন্তর্পণে পিছু হটতে লাগল। আহমদ মুসা। তার বরাবর রাস্তায় দাঁড়ালো লোকটিকে তখনও সে দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ

আহমদ মুসা লক্ষ্য করল বেল্টে ঝুলানো লাল থলের পাশে একটি গ্যাস মাস্ক ঝুলছে। পরক্ষেণেই দেখল লোকটি বেল্ট থেকে ঝুলানো গ্যাস মাস্ক খুলে নিয়ে মুখে পরছে।

আঁৎকে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা কাঁদানো গ্যাস ছুঁড়বে না। বন্দুকগুলো কাঁদানো গ্যাস ছোঁড়ার জন্যও নয়। কাঁদানো গ্যাসের সেলের মতই এক ধরণের গ্যাস বোমা তৈরী হয়েছে। ওগুলোকে কাঁদানো গ্যাসরে মতই বন্দুকে ফিট ককে শত্রুর ওপর ছোঁড়া যায়। চেতনা লোপকারী গ্যাস বোমা এগুলো।

ছোঁড়ার পর কাঁদানো সেলের মত ওগুলো ফাটে, তবে শব্দ করে নয়। শব্দ হয় না বলে শত্রুপক্ষ বুঝতেও পারে না যে, তাদের উপর গ্যাস বোমার আক্রমণ হয়েছে। কিচু বোঝার আগেই ওরা চেতনা হারিয়ে ফেলে শত্রুর হাতে পড়ে যায়। স্থান বিশেষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আজ এটা ব্যবহার হচ্ছে। এই জংগলে যুদ্ধ ওদরে জন্যে মুস্কিল বলেই আহমদ মুসাকে ধরার সহজ পথ হিসেবে এই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছে।

আহমদ মুসা ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলার জন্যে একটা ফাঁকা মত জায়গা ধরে ছুটতে শুরু করল। যতটা সম্ভব এদের আওতা থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সে। কোন কাজ হবে না তবু নাকে রুমাল চেপেছে সে।

শব্দ না হওয়ার জন্য বুঝা যাবে না ভয়ংকর অদৃশ্য গন্ধহীন গ্যাস তাকে কখন আক্রমণ করছে। এখন ভাবছি, পরবর্তীতে ভাবার হয়তো সুযোগ হবে না, এমন নানা চিন্তা কিলবিল করছে আহমদ মুসার মাথায়।

তবু আহমদ মুসা ছুটছে। তার সাধ্য যা, ততটুকু করাই তো তার দায়িত্ব। পরবর্তী দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। এই অটল বিশ্বাস আহমদ মুসার আছে বলেই সে ভাবছে বটে, কিন্তু ভয় পায়নি।

বেশি এগুতে পারল না আহমদ মুসা।

তার সামনে পাথরের একটা নাঙ্গা টিলা পড়ল। তার দু'পাশেই ঘন জংগলের প্রাচীর। সেই টিলা টপকাতে গিয়ে তার মাথায় উটার পর কিছু বুঝে উঠার আগেই সংজ্ঞা হারিয়ে আছড়ে পড়ল টিলার উপর।

জায়গাটা ফাঁকা হওয়ায় এবং উঁচু ঠিলাটি নাঙ্গা হওয়ায় আহমদ মুসা নজরে পড়ল রাস্তায় দাঁড়ালো বন্দুকধারী লোকটির।

সে দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল তার সাথীদের উদ্দেশ্যে। ডাকল সবাইকে।

সবাই ছুটে এল তার দিকে। গাড়ি নিয়ে ছুটে এল গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো দীর্ঘকায় লোকটিও।

গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো লোকটির হাতে একটি দূরবীন ছিল। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে টিলার দিকে তাকিয়ে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক পাওয়া গেছে শয়তানের বাচ্চাকে। শয়তান খুন করেছে স্বামী স্বরূপানন্দকে, কোলম্যান কোহেনকে এবং আমাদরে বহু লোককে। একে জীবন্ত হাতে পাওয়া আমাদের দরকার। যাও তোমরা কয়েকজন গিয়ে তাকে নিয়ে এস।

নির্দেশের সাথে সাথে চারজন ছুটে গেল।

কায়েক মিনিটের মধ্যেই তাকে ধরা-ধরি করে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়।

বলল একজন, 'এর সাথে এই দু'টি ষ্টেনগানও ছিল। এগুলো সে আমাদের লোকদের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল।'

'শয়তান গুলীও খেয়েছে।' বলেই গুলী খাওয়া আহম বাহুতেই জোরে একটা লাথি মারল গলায় গেরুয়া চাদর জড়ানো সেই লোক।

এই গোটা ঘটনা যখন থেকে ঘটতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই রাস্তার ওপাশের পাহাড় শীর্ষে দাঁড়ানো এক ঘোড়সওয়ার সবকিছু অবলোকন করছিল। তার চোখে দূরবীন। তার কাঁধে ঝুলানো বাধা ধরনের টিলিস্কোপিক মিনি মেশিন গান। মাথার টুটি থেকে আপাদ-মস্তক জলইপাই রংয়ের ইউনিফর্ম। বন আচ্ছাদিত পাহাড়ের সাথে সে একদম একাকার। তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। তার পাশে দাঁড়ানো চকলেট রংয়ের ঘোড়াকেই শুধু বেসুরো লাগছে। কালো গগলস পরা লোকটির মুখের খুব অল্পই দেখা যাচ্ছে।

লোকটি এক হাতে ঘোড়ার লাগাম অন্য হাতে কাঁধে ঝুলানো মিনি মেশিনগানটির ফিতা ধরে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে নামছিল।

কিন্তু নিচে রাস্তায় আহমদ মুসাকে ওরা যখন হেলিকপ্টারে তুলতে যাচ্ছিল, তখন সে থমকে দাঁড়াল। ডান হতে থেকে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে দ্রুত বাম কাঁধ থেকে মিনি মেশিনগানটা হাতে নিয়ে তাক করল রাস্তার ওদেরকে। মিনি মেশিন গানের টেলিস্কোপিক লেন্সটায় চোখ রেখে ট্রিগারে তর্জনি রাখর। চেপে ধরল ট্রিগার। ধরেই থাকল।

সিংগল বুলেট ফাংশন একটিভেট করা ছিল মেশিনগাটির। তার ফলে বুলেট ঝাঁক আকারে না বেরিয়ে এক এক করে বেরিয়ে যেতে লাগল।

প্রতিটি গুলী বেরুবার পর লোকটি মিনি মেশিনগানের টেলিস্কোপিক ব্যারেলকে নতুন টার্গেটের সাথে এডজাষ্ট করে নিচ্ছিল অদ্ভুত দ্রুততার সাথে।

মাত্র দশ সেকেন্ড। মিনি মেশিনগানের গর্জন থেমে গেল। নিচে রাস্তায় ১৫টি লাশ।'

বুঝে ওঠা ও প্রতিরোধের কথা বাবতে গিয়ে বোধ হয় পালাবারও চেষ্টা তাদের করা হয়নি।

নিহতদের রক্তস্রোত আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন দেহেও আসছিল।

মিনি মেশিন গানের ব্যারেল থেকে তর্জনি সরিয়ে নিয়েই লোকটি দ্রুত মেশিন গানটাকে বাম কাঁধে চালান করে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠল এবং দ্রুত নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে রাস্তায়।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে আহমদ মুসা। কিন্তু চোখ খুলল না সে।

মনে পড়েছে তার সব কথা। সংজ্ঞালোপকারী গ্যাস আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সে পালাচ্ছিল। কিন্তু পারেনি সে পালাতে। হঠাৎ চিন্তা রুদ্ধ হয় গিয়েছিল, চারদিকটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, এটুকুই শুধু তার মনে আছে। তার অর্থ সে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। তার মানে সে এখন শত্রুর হাতে বন্দী। কিন্তু তার পিঠের নিচের শয্যাটাকে খুব নরম, আরামদায়ক মনে হচ্ছে কেন? এই গেরুয়া বসনা কাপালিকদের বন্দীখানা শুখু নগ্ন মেঝে নয়, তার জন্যে সেটা কাঁটা বিছানো হবার কথা। সন্তর্পণে হাত-পা নাড়ল আহমদ মুসা। না, হাত-পায়ে বাঁধন নেই। এই সাথে সে অনুভব করছে, স্নিগ্ধ বাতাসে তার গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সে বুঝল খোলা জানালা পথে আসা স্বাভাবিক বাতাস এটা। তাছাড়া সে বাতাসের প্রবাহ দেখে বুঝতে পারছে একাধিক জানালা খোলা রয়েছে। তাহলে একটা বন্দীখানা কিভাবে হতে পারে? নরম আরামদায়ক বিছানা, হাত-পা মুক্ত, জানালা খোলা-এ অবস্থায় তাকে কোন বন্দীখানায় রাখা হতে পারে না।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা।

দ্রুত চারদিকটা দেখতে চাইল সে।

কিন্তু তার চোখ দু'টি আটকে গেল বাম পাশে পাশাপাশি দু'চেয়ারে বসা একজন পুরুষ ও একজন মহিলার উপর।

লোকটির রং পিতাভ। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। উচ্চতা মাঝারি। দেহে শক্ত কাঠামোতে সুন্দর স্বাস্থ্য। চেহারায় হাসির প্রলেপ। পরনে বাদামী রংয়ের প্যান্ট ও টিসার্ট। মহিলার সাদা-স্বর্ণাভ রং। একহারা, দির্ঘাঙ্গী। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। পরণে জিনসের প্যান্ট ও জ্যাকেট। তারও বয়স লোকটির কাছাকাছি।

আহমদ মুসা ওদের দিকে চাইতেই লোকটি 'গুড় ইভনিং' বলে স্বাগত জানাল আহমদ মুসাকে।

‘গুড ইভনিং টু বোথ’ বলে আহমদ মুসা নিজের দিকে তাকাল। দেখল তার বাম বাহুতে সুন্দর ব্যান্ডেজ। গায়ের জামা পাল্টানো, নতুন সার্ট গায়ে। প্যান্ট ঠিক আছে, কিন্তু পায়ের জুতা খোলা।

চোখ ঘুরিয়ে আবার আহমদ মুসা তাকাল লোকটির দিকে।

লোকটির মুখে এক টুকরো হাসি ফুঠে উঠল। বলল, ‘আপনার অনুমতি না নিয়েই আমরা আপনাকে অপারেট করেছি।’

কথাটা শেষ করেই হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে একটা বুলেট হাতে নিয়ে বলল, ‘থ্যাংকস গড় যে, বুলেটটি সারফেস সমান্তরালে ঢুকায় পেশির অনেক ক্ষতি হলেও হাড় বেঁচে গেছে।’

‘ধন্যবাদ আপনাদের। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অপারেশন করায় নতুন কষ্ট থেকে বেঁচে গেছি। কিন্তু এত সুন্দর ব্যান্ডেজ! এ তো নিখুঁত ডাক্তারী কাজ!’ বলল আহমদ মুসা।

লোকটি মুখে হাসি নিয়ে তাকাল পাশের মহিলার দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘যিনি করেছেন তিনি ডাক্তার। এ কৃতিত্ব ওঁর।’

আহমদ মুসা ডাক্তার মহিলার দিকে চেয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ ম্যাডাম।’

‘ওয়েলকাম। আহপনার চোখের কোণায় আরও একটি নতুন আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। দেখলাম আরও কয়েকটি বড় আঘাতের চিহ্ন যেগুলো কয়েকনিদ আগের হবে। এ কারণেই আমি প্রতিষেধক ধরনের কোন ইনশেকশন দিইনি। আমি মনে করি ওগুলো দেয়া আভে।’ বলল মেয়েটি খুব শান্ত ও ধীর কণ্ঠে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লোকটি বলে উঠল, ‘আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কখন গুলীবিদ্ধ হলেন? আপনি গাড়ি চালিয়ে ঐ রাস্তার ঐ স্থানে আসা থেকে আপনাকে দেখেছি আমি। দুরবীনে খুঁটি-নাটি সবকিছুই আমার কাছে ধরা পড়েছে। আপিনি একটু কায়দা করে গাড়ির সামনে এগুনো অব্যাহত রেখে আত্নগোপন করার জন্যে লাফিয়ে পড়েছিলেন গাড়ি থেকে। তারপর থেকে আপনাকে কেউ গুলী করার ঘটনা তো আমার মনে পড়ছে না।’

আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগেই ডাক্তার মেয়েটি কথা বলে উঠল। বলল, 'তুমি যে সময়ে তাঁকে দেখেছ বলেছিলে, আহত স্থান দেখে আহত হওয়াটা তার আগে বলে আমার মনে হয়েছে।'

'ডাক্তার ম্যাডাম ঠিক বলেছেন। আগেই আমি আহত হয়েছিলাম। আজ সকালের দিকে ওরা আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসে। ওদের বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় আমি আহম হই। ওরা আমাকে ধরার জন্যেই ফলো করছিল।' বলল আহমদ মুসা ডাক্তার মেয়েটির কথা শেষ হতেই।

'ওহ তো! আপনার সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি। আপনাকে কেন ওরা বন্দী করে এনেছিল? পালাবার পর কেনই বা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল ওর আপনাকে ধরার জন্যে? ওরা কারা?' বলল লোকটি।

আহম মুসা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কি বলা উচিত তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল। এই দ্বিধাগ্রস্ততা নিয়েই তাকাল আহমদ মুসা ওদের দিকে।

আহমদ মুসার দ্বিধাগ্রস্ততা লক্ষ্য করল লোকটি। গম্ভীর হলো সে। বলল, 'আপনার সমস্যা বুঝেছি। কি বলবেন, কতুটুকু বলবেন তা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, অন্য কারও পক্ষে আমাদের কাজ করার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা আপনার বন্ধু হতে পারবো কিনা জানি না, তবে একজন অতিথির শত্রু আমরা কিছুতেই হবো না।'

লজ্জা মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। বলল, 'ধন্যবাদ আপনাদের। মানুষের কতকগুলো স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে, আমি তার উর্ধে নই।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এককভাবে ভাড়া করা বোট নিজেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিছিলাম 'রস' দ্বীপে। 'রস' দ্বীপে পৌঁছার আগেই একটা হেলিকপ্টার থেকে ফাঁদ ফেলে আমাকে বন্দী করে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়।' এরপর বন্দীখানা থেকে পালানো পর্যন্ত সব কথা ওদের বলল আহমদ মুসা।

ওরা গভীর মনোযোগ দিয়ে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। আহমদ মুসা থামতেই লোকটি বলে উঠল, 'বুঝতে পারছি, আপনি ওদের আট-দশজন লোক মেরেছেন। সুতরাং ওরা মরিয়া হয়ে উঠার কথাই। কিন্তু এটা তো পরের কথা।

আমার বিস্ময় লাগছে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে অভিনব অবস্থায় বন্দী করল ওরা কারা? এবং এভাবে আপনাকে বন্দী করতে হলো আপনার কোন অপরাধে বা তাদের কোন স্বার্থে?'

'আমার অপরাধ বোধ হয় এই যে, ওরা 'রস' দ্বীপে একজন যুবককে বন্দী করে রেখেছে, আমি তাকে উদ্ধার করতে চাই। আরও অপরাধ হলো, ওরা এ পর্যন্ত আন্দামান-নিকোবরের অর্ধশতকের মত যুবককে হত্যা করেছে, আরও হত্যা করতে চায়। কিন্তু ওরা মনে করেছে যে, ওদের পরিকল্পনায় আমি বাধ সাধছি।'

'পঞ্চাশ জন খুন করেছে? এত সংখ্যাক খুনের খবর তো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি!' বলল ডাক্তার মহিলাটি।

'সবগুলো খবরই দুর্ঘটনা বা অপঘাতে মৃত্যু হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। অধিকাংশই পানিতে ডুবে মরার খবর হিসেবে পত্রিকায় এসেছ।'

'হ্যাঁ, এমন খবর পত্রিকায় বেশ পড়েছি। এগুলো কি সবই খুন তাহলে?' ডাক্তার মহিলাটি বলল।

'কোন সন্দেহ নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'পুলিশ জানে?' জিজ্ঞাসা মহিলাটির।

'সবাই হয়তো জানে না, কিন্তু পুলিশের একটা বড় অংশ এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আছে।'

'ষড়যন্ত্রটা কি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল। একটু ভাবতে চাইল। একটু চিন্তা করে বলল, 'ওটা একটা নির্মুল করার প্রোগ্রাম। একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীকে শেষ করার প্রোগ্রাম।'

ডাক্তার মহিলা ও লোকটি দু'জনেই কপাল কুঞ্চিত হলো। একটা জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা ওদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়ল।

'কোন জনগোষ্ঠীকে?' এবার প্রশ্ন ছেলেটির।

আহমদ মুসা উঠে বসেছিল।

কিন্তু মহিলাটি চেয়ার থেকে উঠে ছুটে এল। বসতে বাধা দিয়ে আবার শুইয়ে দিল আস্তে আস্তে। বলল, 'আপাতত কিছুটা সময় স্থির শুয়ে থাকতে হবে। উঠতে গেলে আহত জায়গায় প্রেসার পড়বে। আবার ব্লিডিং হবে। অনেক ব্লিডিং হয়েছে। আর ব্লিডিং হতে দেয়া যাবে না। জানেন তো এটা জংগল, রক্ত দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।'

'স্যরি ম্যাডাম।' বলল আহমদ মুসা।

'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ।' বলে মহিলা তার চেয়ারে ফিরে এল।

'উঠে বসে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলুন।' বলল লোকটি।

'আমাদের পারস্পরিক পরিচয়টা হয়ে গেলে ভাল হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আলোচনা ফ্রি হবার জন্যে?' ডাক্তার মহিলাটি বলল।

'ঠিক তাই।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু পরিচয় হবার পর যদি আবার কিছু কথা লুকোবার প্রয়োজন হয় উভয় পক্ষেই? পরিচয় হলেও মুক্ত আলোচনায় সমস্যা আছে।' মেয়েটি বলল।

'লুকানোটাই যদি কল্যাণকর মনে হয়, তাহেল সেটাও মনে করি ঠিক আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'চমৎকার বলেছেন আপনি। সব কথা বলা সময় কল্যাণকর হয় না।' লোকটি বলল।

কথা শেষ করেই চেয়ার ঠেস দিল লোকটি। চোখে-মুখে একটা গাম্ভীর্য নেমে এল হঠাৎ। বলল, 'আমাদের কথাই প্রথম বলি। আমার পিতা ভারতীয়, মা থাইল্যান্ডের মেয়ে। আমার পিতৃদত্ত নাম ড্যানিশ দেবানন্দ। আমার মা আমার নাম দেন মংকুত চোলালংকন, প্রথম থাই রাজার নাম অনুসারে। আমার মা'র গর্ব ছিল তিনি চীন থেকে আসা থাইল্যান্ডের প্রথম রাজা মংকুত পরিবারের মেয়ে। আমি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় বিয়ে করি আমার পাশে উপবিষ্ট তখন ডাক্তারী পড়ুয়া মহারাষ্টের মেয়ে এই সুস্মিতা বালাজীকে। এটা হলো আমাদের পরিচয়ের প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বটা হলো, আমরা দু'জন

ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার এই জংগলে এলাম কি করে? আমরা দু'জন পিতৃ-মাতৃহত্যার দায় মাথায় নিয়ে পালিয়ে বাস করছি এই জংগলে।' থামল ড্যানিশ দেবানন্দ।

আহমদ মুসার কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সে ভাবছিল।

ড্যানিশ দেবানন্দ থামতেই আহমদ মুসা বলল, আপনি কোথায় চারকি করতেন?'

'পোর্ট ব্লেয়ারের ইন্ডিয়ান রোডস্ এন্ড কম্যুনিকেশন ডিপার্টমেন্টে।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আপনার পুরো নাম কি ড্যানিশ দিব্য দেবানন্দ?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

চমকে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?'

'আপনার পিতার নাম কি ড্যানিশ দিনা প্রেমানন্দ এবং মার নাম সাবিতা থানাবাতান?'

'হ্যাঁ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে। বিস্ময়ে বিস্ফোরিত তার দু'চোখ। একবার তাকাল সে স্ত্রী সুস্মিতা বালাজীর দিকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনি এত কিছু জানলেন কি করে? আপনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক নন তো?'

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমি গোয়েন্দা নই। তবে একজন সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমার বন্ধু লোক। তাঁর কাছেই অন্য একটি বিষয়ে শুনতে গিয়ে আপনাদের প্রসঙ্গ ঘটনাক্রমে আসে। আপনি আপনার পিতা-মাতাকে খুন করেননি, এটাই ঠিত তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি এতোসব বলেছেন কি করে? তিনিই বা কি করে বলেছেন?'

'হ্যাঁ। আপনারা ভিন্ন বাড়িতে থাকতেন। আপনার পিতা-মাতা খুন হওয়ার পরপরই আপনার টেলিফোন পেয়ে আপনার পিতা-মাতার বাড়িতে পৌঁছান। গিয়ে আপনারা দেখতে পান তাঁরা দু'জনেই ছুরিবিদ্ধ। তারা তখন মুমুর্ষূ। আপনারা দু'জনে তাদের দু'জনের দেহ থেকে ছুরি খুলে ফেলেন। এই সময় সেখানে আপনাদের পরিচিত কেউ পৌঁছেন। তারা খুনের দায়ে আপনাদের

অভিযুক্ত করেন এবং বাইরে দাঁড়ানো নকল পুলিশকে দেখিয়ে আপনাদের ধরিয়ে দেয়ার ভয় দেখান। মুক্তির বিনিময়ে তারা একটি বিলে সই ও আপনার পিতার ফার্মের মালিকানা দাবি করেন। একদিকে পিতা-মাতার মৃত্যু, অন্যদিকে তাদের হত্যার দায় ঘাড়ে এসে পড়ায় বিপর্যস্ত আপনারা তাদের সব দাবি মেনে নিয়ে পালিয়ে আসেন।' থামল আহমদ মুসা।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তখন ড্যানিশ দেবানন্দ এবং ডাক্তার সস্মিতা বালাজীর।

আহমদ মুসা থামতেই ড্যানিশ দেবানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'আপনার কথার প্রতিটি বর্ণ সত্য। কিনতু সেই গোয়েন্দ কর্মকর্তা এসব জানলেন কি করে? এ তো কারও জানার কথা নয়। এসব তিনি আপনাকে বললেনই বা কেন?'

'আমার সেই সাবেক গোয়ান্দো বন্ধু সে সময় আন্দামন-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জির প্রধান গোয়েন্দা কর্মকতা ছিলেন। তিনি ঐ ঘনটার তদন্দ করেছিলেন। তিনি মহাগুরু শংকারাচার্য শিরোমনিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। শংকরাচার্য সব বিষয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি সব কথা নাকি খুলে বলেছিলেন। কিন্তু চার্জ শিটের আগেই মামলার কার্যক্রম অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হয়ে যায়।'

আবেগ-উত্তেজনায় ধপ করে আবার চেয়ারে বসে- পড়ল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন? আমার এ দুর্দশা ও আমার পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ এই মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি। কিন্তু তিনি কি আমার পিতামাতাও খুনি?

'সব আলোচনা তিনি করেননি। তবে এটুকু বলেছিলেন, আপনার আব্বার ড্রইংরুম, করিডোর এবং বাইরের গেট সব জায়গায় টিভি ক্যামেরা ছিল। শংকরাচার্য এটা জানতেন না। তদন্তে গিয়ে সব ফিল্ম তিনি পেয়ে যান। যার ফলে শংকরাচার্য কোন অপরাধই গোপন করতে পারেননি।'

'থ্যাংকস গড়। আমি ঈম্বরের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঈশ্বর অবশ্যই আছেন, তা না হলে দৃশ্যপট এভাবে উল্টে গেল কেমন করে?'

আহমদ মুসা ভাবছিল মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনির ব্যাপার। ড্যানিশ দেবানন্দ তাকে চেনে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কতটুকু চেনে, কতটা জানে তাকে। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সে কি জানে? ড্যানিশ দেবানন্দ থামতেই আহমদ মুসা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শংকরাচার্য শিরোমনির সাথে আপনার বিরোধরে কারণ কি? তার সাথে আপনাদের জানা-শোনা কিভাবে, কেমন করে, কতটুকু জানেন তাকে আপনি?'

একটু ভাবল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'যতদুর মনে পড়ছে শুরুর দিকে শংকরাচার্য ও তার লোকোরা আসতেন মহারাষ্ট থেকে। 'শিবাজি সন্তান সেনা' নামে তাদের কি এক সংগঠন আছে। সংক্ষেপে বলত, 'সেসশি' বা সূর্য। এই সংগঠনের জন্যে মোটা চাঁদা নিত প্রতিবছর। তারা বলত, জাতির প্রতিরক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কাজ করছে। আমি বাঙ্গালোর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আন্দামানে ফিরে এলাম। বাবার বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কনষ্ট্রাকশন ফার্ম ফিল এখানে। কিন্তু আমি তাতে যোগ না দিয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। এর বড় কারণ ছিল বাবার টাকা কামাবার কৌশল আমার পছন্দ হতো না। সরকারি কনষ্ট্রাকশন ফার্মে যোগ দিলে শংকরাচার্য ও তার লোকরা আমার কাছে যাওয়া আশা শুরু করল। তাদের আবেগ-উত্তেজনাকর কথা আমার খুব পছন্দ হতো। আমি............।'

'তাদের আবেগ উত্তেজনাকর কথাগুলো কেমন ছিল?' ড্যানিশ দেবানন্দের কথার মাঝখানে বলে উঠল আহমদ মুসা।

'শমাংক, শংকরাচার্য, শিবাজী, গান্ধীর জীবন তারা সমানে নিয়ে আসত। বলত যে, তাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্যেই আমাদের সংগঠন। তারা ভারতবর্ষকে আর্য-মুনি-ঋষিদের শাস্তিত সাম-গান ধ্বনিত এক স্বর্গ বানাতে চেয়েছিলেন। সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করে ভারতবর্ষকে সেই রূপ দেয়অর জন্যেই আমরা কাজ করছি। তাদের এই কথা আমার খুব ভালো লাগত। এই ভালোলাগার কারণেই আমি ওদের

অনেক প্রোগ্রামে গেছি, ওদের অফিসগুলোতে গেছি। কিন্তু..............।

আবার ড্যানিশ দেবানন্দের কথায় বাধা দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘আন্দামানেও কি তাদের অফিস ছিল? কোথায় ছিল?’

‘অফিস ছিল, গোপনে পরিচালিত তাদের প্রধান অফিষ ছিল ‘রস’ দ্বীপের ফাষ্ট সার্কেলে, যেখানে আন্দামানের গভর্নরের অফিস, বাসভবন ও ডিফেন্স ষ্টোরেজ ছিল। ডিফেন্স ষ্টোরের পাশেই গভর্নর ও তার পরিবারের আন্ডার গ্রাউন্ড শেল্টার ছিল তাদের প্রধান অফিস। সে আন্ডা গ্রাউন্ড শেল্টারের মাটির উপর ছিল গভরর্নর ভবনের ব্যাকওয়ার্ড এক্সিট বা পেছনের দরজা। সেটা ছিল কয়েকটি ঘরের সমষ্টি পাথরের তৈরি দু’তলা একটি স্থাপনা। এখান দিয়ে যেমন বাইরে বের হওয়া যায়, তেমনি আন্ডার শেল্টারে যাওয়া যায়। অন্যদিকে আন্ডারগ্রাউন্ড শেল্টার থেকে ডিফেন্স গোডাউনে যাওয়ারও পথ আছে। ১৯৪১ সালে জুনের ভুমিকম্পে গভর্নর ভবনসহ রস দ্বীপের সব সরকারি স্থাপনা মাটির সাথে মিশে গেছে। কিন্তু আন্ডার শেল্টার, এর মাথার উপরের দু’তলা অংশ এবং ডিফেন্স গোডাউন সম্পুর্ণ অক্ষত রয়ে গেছে। এটাই শংকরাচার্যদের ‘সেসশি’ বা ‘সূর্য’ সংগঠনের আন্দামান হেড কোয়ার্টার। কিন্তু এখানে সাইনিবোর্ড আছে পুরাতত্ত্ব পবিভাগের আঞ্চলিক অফিসের। অফিসে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, ফাইল ছাড়া কোন কাজ নেই। পরিচালকসহ দু’তিন জন কর্মচারী আছে তারা কার্যত ‘শিবাজী সন্তান সেনা’ ‘সেসশি’র বেতনবুকে পরিণত হয়েছে। আন্দামান নিকোবরের সবগুলো পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসই তাদের দখলে। এসব অফিসের কয়েকটিতে আমি গিয়েছি।’ থামল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সে থামতেই আহমদ মুসা বলল, ‘আপনি ওদরে কথা পছন্দ করতেন। বলুন তার পরে কথা।’

‘হ্যাঁ, ওদের কথা-বার্তা ও কাজ আমার খুবই পছন্দ হতো। কিন্তু পরে এই পছন্দ আমি ধরে রাখতে পারিনি। প্রথমেই মন আমার বিষিয়ে ওঠে তাদের একটা দাবি শুনে। এক কোটি টাকা বাজেটের একটা রোড কনষ্ট্রাকশন তখন আমার হাতে নিয়েছিলাম। স্বয়ং মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি আমাকে এসে বললেন, প্রকল্পের অর্ধেক টাকা তাদের ফান্ডে দিতে হবে। তার মানে প্রকল্পের ১ কোটি টাকা মধ্যে ৫০ লাখ টাকাই তাদের দিতে হবে। বিস্ময়ে আমার চোখ ছাড়াবড়া।

বললাম, ‘কেন দিতে হবে?’ ‘জাতির জন্যে জাতির কাজে।’ বললেন তিনি। ‘কিভাবে দেব? এ টাকা তো জাতির কাজের জন্যেই।’ বললাম আমি। ‘তোমাদের প্রকল্প দেশের কাজের জন্যে, জাতির কাজের জন্য নয়। দেশ ও জাতি এক নয়। দেশ এখন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলের। এই দেশ পবিত্র না করতে পারা পর্যন্ত দেশের স্বার্থের প্রতি আমাদের কোন আগ্রহন নেই।’

তার এই কথা সেদিন আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। তাদের ভেতরের জঘন্য রূপ আমাকে আতংকিত করে তুলেছিল। আমি সেদিন তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এই বলে যে, আমার এই চাকরিটা দেশের স্বার্থ দেখার জন্যে। আমি দেশের এক পয়সাও প্রকল্পের বাইরে খরচ করতে পারবো না। আমার প্রত্যাখ্যানকে শংকরাচার্য তাদের চূড়ান্ত অপমান ও আমার জাতিদ্রোহিতার হিসেবে দেখেছিল। আমি না বুঝলেও সেই থেকে আমার ও আমার পরিবারের প্রতি তাদের শত্রুতার শুরু। আরেকটা ঘটনা ঘটতে দেখেছি পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে আমার চোখের সামনে। সেদিন সেলুলার জেল প্রতিষ্ঠার দিনকে ‘কালো দিবস’ হিসাবে পালনের অনুষ্ঠান ছিল। সরকারি প্রয়োজেন অনুষ্ঠান হচ্ছেল। সেলুলারে যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, যারা জেলে মারা গেছেন এবং সেলুলার জেলে যারা ফাঁসিতে জীবন দিয়েছিলেন, তাদের সচিত্র বিবরণ অনুষ্ঠানের মঞ্চ ও দেয়ালে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তার মধ্যে আন্দামানের লর্ড মেয়োকে হ্যত্যাকারী সেলুলার জেলের কয়েদী সেলুরার জেলেই ফাঁসিতে জীবন দানকারী শের আলী, সেলুলার জেলের সুপরিচিত কয়েদি দামোদর সাভারকার এবং সেলুলার জেলে মৃত্যুবরণকারী একজন দাশীনক মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী-এই তিনজনের সচিত্র বিরণ মঞ্চের দেয়ালে টাঙানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরু হলে স্বাগত বক্তব্য দেয়ার সময় মহাগুরু শংকরাচার্য এবং স্বামী স্বরূপানন্দ সামনের কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত ভাষণ থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘মঞ্চের দেয়াল থেকে শের আলী ও মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদীর সচিত্র বিবরণসহ অনুষ্ঠান কক্ষের দেয়ালে মুসলিম নামের যাদের পরিচিতি টাঙানো আছে, সব সরিয়ে ফেলা হোক।’ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেলেন ভারতীয় ইতিহাসের প্রবীণ প্রফেসর এবং আন্দামান-নিকোবর

স্মৃতিরক্ষা প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক রমানন্দ রাধাকৃষ্ণাণ। তিনি হাত জোড় করে তাদের বসতে অনুরোধ করে বললেন, শের আলী ও মাওলানা খয়রাবাদীসহ তাদের বিবরণ সরিয়ে নিলে, তাদের প্রতি যেমন অসম্মান হবে, তেমনি আমাদের অনুষ্ঠানেরও অঙ্গহানি হবে।'

তার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান হলে চল্লিশ পঞ্চাশ জুন গেরুয়াধারী দাঁড়িয়ে গেল এবং একযোগে চিৎকার করে বলল, 'ওদের সরিয়ে দিন। ওরা কেউ নয়, ওরা কেউ নয়?' বুঝলাম শংকরাচার্য আট-ঘাট বেঁধে এসেছে।

রমানন্দ রাধাকৃষ্ণাণ আবার হাত জোড় করে বললেন, 'সম্মানিত উপস্থিতি, ্কষদিরাম যেমন ভারতীয় ইতিহাসের জাতীয় বীর, তেমনি শের আলীও। সাভারকার যেমন আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তেমনি ফজলে হক খয়রাবাদীর আত্মদানও আমাদের গর্বের বস্তু। আমি আপ........।'

কথা শেষ করতে পারলো না রাধাকৃষ্ণাণ। দর্শকের আসন থেকে শকরাচার্য এবং স্বরূপানন্দ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধাকৃষ্ণাণের উপর। তাদের হারেদ ত্রিশুল দিয়ে তার উপর প্রহার শুরু করল। ওদের হাত থেকে রাধাকৃষ্ণাণকে যখন উদ্ধার করা হলো, তখন তিনি রক্তাক্ত। অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে গেল। এই ঘটনার পর আন্দামানের সেলুলার জেল ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান ও রেকর্ড থেকে ভোজবাজীর মত মুসলিম নাম উবে গেল।

এই ঘটনার পর আমি শংকরাচর্যদের ঘৃণা করতে শুরু করি। এরপর আমি কোন কাজেই ওদের সহযোগিতা করিনি।'

দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে থামল ড্যানিশ দেবানন্দ। থেমেই আবার বলে উঠল, 'আমি অনেক কথা বলেছি, এবার আপনি বলুন।'

বলে চেয়ারে হেলান দিল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'ঠিক বলেছ, আমরা তো ওঁর নাম পর্যন্ত এখনও জানি না।'

বলে তাকাল ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আমার বিস্ময় লাগছে শংকরাচার্যদের ব্যাপারে আপনার আগ্রহ দেখে। আপনি আপনার বন্ধু সাবেক গোয়েন্দার কাছে প্রসংগক্রমে শংকরাচার্যের সম্পর্কে

শুনেছেন। কিন্তু শুধু এটুকু শোনা থেকে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এত আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।’

‘ঠিক বলেছেন। শংকরাচার্যদের সম্পর্কে আমিও কিছু জান, তাই আরও কিছু জানার চেষ্টা করছি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন?’ ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী বলল।

‘আমি শুধু শংকরাচার্য নয়, তাদরে ‘সেসশি’ অর্থাৎ ‘শিবাজী সন্তান সেনা’দের সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাই। স্বামী স্বরূপানন্দ এখন নেই এবং মহাগুরু স্বামী শংকরাচার্য শিরোমনিও এখন পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন বটে, কিন্তু তাদের শিবাজী সন্তান সেনা এখনও তাদের মতই ভয়ংকর।’

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বলল ড্যানিশ দেবানন্দ, ‘শংকরাচার্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং স্বরূপানন্দ নেই মানে?’

‘স্বামী স্বরূপানন্দ নিহত হয়েছে আজ কিছুক্ষণ আগে এবং শংকরাচার্য দু’দিন আগে ভাইপার দ্বীপের পুরানো জেলখানায় শের আলীর বসবাস ও ফাঁসির স্থানেই মৃত্যুর মুখ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে।’ বলল আহমদ মুসা গম্ভীর কণ্ঠে।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর বিস্ময় ভরা দুই জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। দু’জনেই উন্মুখ হয়ে উঠেছে কিছু বলার জন্যে। সুস্মিতা বালাজীই আগে বলে উঠল, ‘এতটা বিস্তারিত খবর ও নিখুঁত তথ্য আপনি জানেন কি করে? আপনি কি সবকিছু.....।’ কথা শেষ না করেই থেমে গেল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘যার নেতৃত্বে আমাকের আজ বন্দী করা হয়েছিল তিনি স্বামী স্বরূপানন্দ। আমি বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় যারা মারা গেছে, তাদের মধ্যে স্বামী স্বরূপানন্দও আছে। আর শংকরাচার্যরা আন্দামানে আমার গাইড ও সাথী গোপী কিষাণ গঙ্গারাম ওরফে গাজী গোলাম কাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল ভাইপার দ্বীপের ঐ জেলে। আমি তাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। সংঘর্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে শংকরাচার্যও

থাকার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভাঙ্গ জেলখানার আন্ডার গ্রাউন্ড গোপন পথ দিয়ে সে পালাতে সক্ষম হয়।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে বিস্ময়-কৌতুহল আরও বেড়েছে। তারা দেখছে আহমদ মুসাকে। হঠাৎ তাদের মনে হচ্ছে, যে সহজ সরল যুবককে তারা দেখছে, সে যেন আসলে অন্য কেউ, অন্য কিছু। তার বয়সের চেয়ে, তার আকারের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠল যেন সে। কথা বলে উঠল ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'এবার আপনার সম্পর্কে দয়া করে কিছু বলুন।'

আহমদ মুসা তাকাল ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর দিকে। বলল, 'এভাবে কথা বললে আমার কথা আমি বলতে পারবো না। কোন বড় বোন কি এভাবে কথা বলে?'

চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাক্তা সুষ্মিতা বালাজীর। বলল, 'বড় বোন? বড় বোন বলছেন আমাকে?'

'কেন বড় বোন হতে পারেন না? আমার জীবনে অনেক ছোট বোন পেয়েছি, কিন্তু বড় বোন একটিও পাইনি। বড় বোনের মধুর অভিভাবকত্ব আমার কাছে এক স্বপ্ন।' বলল আহমদ মুসা। হাসি দিয়ে কথা শুরু করলেও শেষে আহমদ মুসার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল।

আগেবে ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর চোখ-মুখ। বলল, 'থ্যাংকস গড়। কেন পারবো না বড় বোন হতে। আমার কোন ছোট ভাই নেই। ঈশ্বর যদি একটি ছোট ভাই দেন, সেটাকে আমি অসীম দয়া বলেই গ্রহণ করব।' আবেগ-ঘন কণ্ঠে বলল ডাক্তার সুষ্মিতা।

'এবার বড় ভাইটি তোমার নাম?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল।

আহমদ মুসা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'কোন নাম বলব, পাসপোর্টের নাম, না পিতা-মাতার দেয়া নাম? আমার...............।'

'দুই নাম তো হয় না। পিতা-মাতার দেয়া নামই তো পাসপোর্টের নাম হয়। নাম বদলালেও নাম একটাই হয়ে থাকে।'

‘আমি আন্দামানে আসার সময় মার্কিন পাসপোর্ট নিয়ে এসেছি। এ পাসপোর্টে আমার নাম দেয়া হয়েছে বেভান বার্গম্যান। এটাই এখন আমার নাম।’ বলল আহমদ মুসা।

‘মার্কিন পাসপোর্ট নেয়ার আগে কোন দেশের পাসপোর্ট ছিল? কি নাম ছিল?’ জিজ্ঞাসা করল ডাক্তা সুষ্মিতা বালাজী।

‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন পাসপোর্ট দিয়েছে, তেমনি অনেক দেশই দিয়েছে আমাকে পাপোর্ট। নামও বিভিন্ন হয়েছে।’

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী দুজনের চোখই বিষ্ময়ে বিস্ফোরিত। বলল সুষ্মিতা বালাজীই আবার, ‘আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন নামের পাসপোর্ট থাকে। কিন্তু তোমাকে তো ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে না।’

‘ক্রিমিনালদের যারা ধরে তাদের কিন্তু এ রকম পাসপোর্টের দরকার হয়ে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে কি তুমি গোয়েন্দা? ইন্টারপোলের কেউ?’ ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

‘না গোয়েন্দা নই, পুলিশও নই।’

‘কিন্তু ছদ্মনামে তাহলে আন্দামানে এলে কেন?’

তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আসল নামে এলে প্রতিপক্ষ সাবধান হয়ে যেত। আমি চাইনি ‘মিশন’ সফল করার আগেই ঝামেলায় পড়ি।’

‘এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তোমার নাম তোমার প্রতিপক্ষ এবং অনেকেই আগে থেকেই জানে। তোমার প্রতিপক্ষ এখানে কে? তোমার মিশন এখানে কি?’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

প্রতিপক্ষের কাউকেই চিনতাম না। এখানে এসে তাদের মধ্যে যাদের চিনেছি তারা হলেন মহাগুরু শংকরাচার্য শিরোমনি, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং দেখেছি নাম না জানা কিছু লোককে।’

‘অবাক ব্যাপার, মিশন নিয়ে এসেছ, অথচ তাদের কাউকে চেন না, নামও জান না! মিশনটা কি ছিল?’ জিজ্ঞাসা ডাক্তার সুষ্মিতা বালাজীর।

‘ধরুন একটা খুন হলো। খুনিকে ধরার মিশন নিয়ে এলেন। খুনিকে চেনা মিশনের শর্ত নয়।’

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘ঠিক। কিনতু তুমি কি সেরকম কোন মিশন নিয়ে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি সেটা?’

‘যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম। গত কিছুদিনের মধ্যে প্রায় অর্ধ শতের মত লোক খুন হয়েছে আন্দামান নিকোবরে। খুন বলে প্রচার হয়নি। প্রচার হয়েছে তারা অপঘাতে মারা গেছে। কিন্তু আসলেই সবগুলো কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। সবচেয়ে লক্ষনীয় হলো হত্যার শিকার সবাই একই কম্যুনিটির লোক। দ্বিতীয়.........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘কোন কম্যুনিটির লোক তারা?’

‘মুসলিম।’

ভ্রুকুঞ্চিত হলো ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুষ্মিতা বালাজীর। গম্ভীর হয়ে উঠল তাদের মুখ।

‘দ্বিতীয় যে বিষয়’, আবার কথা শুরু কলল আহমদ মুসা, ‘ভয় হলো, ‘রাবেতায়ে আলম আল ইসলামী’ নামের আন্তর্জাতিক একটি মুসলিম সংগঠন পোর্ট ব্লেয়ার উপসাগরের ‘সবুজ দ্বীপটি’ ভাড়া নিয়ে সেখানে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক একটা কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিল। সে কমপ্লেক্সটি রাতারাতি দ্বীপ থেকে উধাও হয়েছে। কোন স্থাপনা সেখানে ছিল, এ চিহ্নও নেই। তৃতীয়ত, ভারতের মোঘল রাজবংশের ধ্বংসাবশেষের একটা টুকরো আন্দামানে ছিল। যুবক আহমদ শাহ্ আলমগীর এখানকার মোগল পরিবারটির একমাত্র পুরুষ সন্তান। সে নিখোঁজ এবং তার মা এবং একমাত্র বোনের জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। এই রহস্যপূর্ণ ও উদ্বেগজনক বিষয়গুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার মিশন নিয়েই আমি আন্দামানে এসেছি। এই মিশন ছাড়া আন্দামানের আর সবটাই ছিল আমার কাছে অন্ধকার।’

'অন্ধকারে আলো জ্বলল কি করে? শংকরাচার্যদের সন্ধান পেলে কি করে?' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা আন্দামানে আসার পথের ঘটনা, পোর্ট ব্লেয়ারের একজন শিক্ষক গঙ্গারাম তিলকের সাথে সাক্ষাত এবং পোর্ট ব্লেয়ারে আবার পর গোপী কিষণ গঙ্গারামের সাথে পরিচয় হওয়া এবং প্রাথমিক ঘটনাগুলোর সব বিবরণ দিয়ে বলল, আহমদ শাহ্ আলমগীরের বাসায় পৌঁছতে সেদিন একটু দেরি হলে তার মা বোনকে পাওয়া যেত না। কিডন্যাপ থেকে তাদরে রক্ষা করতে দিয়ে দশ বারো জনের জীবনহানী ঘটেছে। তারপর ওদেরকে হোটেলে রাখা, গোপী কিষণ গঙ্গারাম কিডন্যাপ হওয়া থেকে পরবর্তী সব ঘটনা বলল আহমদ মুসা।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিমা বালাজী দু'জনেরই চোখে-মুখে অপার বিষ্ময়। ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'তুমি দেখছি রীতিমত লড়াইয়ের মধ্যে আছ।'

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই সুষ্মিতা বালাজী বলল উঠল, 'কি বলছ, শাহ্ বানু ও তার মাকে একদম গভর্নরের বাড়িতে নিয়ে রেখেছ!

'গভর্নর বিবি মাধবের মেয়ে সুষমা রাও আহমদ শাহ্ আলমগীরকে ভালবাসে এবং তার খাতিরেই সে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে।' আহমদ মুসা বলল।

হাসল সুষ্মিমা বালাজী। বলল, 'মহারাষ্ট্রের বিশেষ করে বালাজী রাও বংশের মেয়েরা রাজপুত মেয়েদের মতই। এরা কথা দিয়ে জীবন দিয়েও রাখে।'

হাসল ড্যানিশ দেবানন্দও। বলল, 'আমি ভাগ্যবান স্বীকার করতেই হবে।'

বুঝার চেষ্টা করে আহমদ মুসাও হেসে উঠল। বলল, 'আমিও ভাগ্যবান যে আমার আপা বালাজী রাও পরিবারের।'

মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে সুষ্মিতা বালাজী বলল, 'ভাগ্যবান হতেই হবে। বালাজীরা শুধু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারই নয়, তারা মারাঠা শক্তির স্রষ্টা।'

'ধন্যবাদ আপা। কিন্তু বলুন তো গভর্নর বালাজী বাজীরাও মাধন পরিবারের সাথে আপনার যোগাযোগ এখন কেমন?' বলল আহমদ মুসা।

গম্ভীর হলো সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'তিনি আমার মামা। কিন্তু যোগাযোগ নেই গত বিশ বছর।' সুষমা' আমারই দেয়া নাম। আমি দেখেছিও তাকে সেই বিশ বছর আগে।'

'আপনাদের বিপদে কোন সাহায্য তাদের নেননি?' আহমদ মুসা বলল।

'সে অনেক কথা। আমার অসমবর্ণ বিয়েকে আমাদের পরিবার গ্রহণ করেনি বলে আমি কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে যাইনি। তাছাড়া আমাদের কাছে পুলিশের চেয়ে বড় বিপদ ছিলেন শংকরাচার্যরা।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ মুখ খুলল। বলল, 'দেখ সুষ্মিতা, বত্রিশ সিংহাসনের কেচ্ছার মত আমাদের কথায় কিন্তু নানা শাখা গজাচ্ছে। আসল কথাই এখনও আমরা জানিনি। এতক্ষণ তোমার ভাইয়ের যে কাহিনী আমরা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে আমরা আরেক রবিনহুডের পাশেই বসে আছি। কিন্তু রবিহুডের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না।'

সুষ্মিতা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। তারও মনে এই একই কথা। মাত্র একজন লোক বাইরে থেকে আন্দামানে এসে নিজের কোন স্বার্থে জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লো, অসম সাহসের সাথে বিরাট এক পক্ষকে মোকাবিলা করলো, পথে দাঁড়ানো সব শক্তিই এ পর্যন্ত যার কাছে পরাভূত হলো, বিষ্ময়কর এই ব্যক্তিটি কে? ড্যানিশ দেবানন্দের কথা কানে যাওয়ার পর সুষ্মিতা বালাজির ভাবান্তর ঘটল। বলল, 'দেবানন্দ ঠিক বলেছে। তোমার সত্যিকার নামই তো আমাদরে এখন ও জানা হয়নি, তোমার পরিচয়ও বলনি।'

'আপনাদের কম্পিউটার আছে?'

'আছে। কিন্তু তুমি অন্য কথায় যাচ্ছ কেন?'

'যাইনি। কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন আছে?'

'অবশ্যই। আমাদের সংবাদপত্রের তৃষ্ণা মেটেতো ইন্টারনেট দিয়েই। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ প্রসঙ্গ আনছ কেন?' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'প্রাসঙ্গিকভাবেই বলছি। কোথায় আপনাদের কম্পিউটার?'

উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, ‘সুষ্মিতা, কম্পিউটার এখানেই নিয়ে আসি।’

বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যে সে কম্পিউটার ঠেনে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কম্পিউটার দাঁড় করাল আহমদ মুসার মাথার কাছে।

ড্যানিশ দেবানন্দ তার চেয়ারে ফিরে এল।

আহমদ মুসা উঠে বসতে গেলে সুষ্মিতা বালাজী তাকে ধরে বসাল।

‘আপা, আপনি দেখছি আমাকে পরনির্ভরশীল করে ছাড়বেন। এর চেয়ে অনেক অনেক খারাপ অবস্থাতেও কেউ আমাকে এভাবে সাহায্য করে না।’

‘বউ এখানে হাজির নেই। তার বিরুদ্ধে বদনাম ছড়িও না।’

‘বদনাম নয় আপা। এমন অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে সে সাহস দেয় আর বলে, উঠে উঠে যাচ্ছ, কোন কষ্ট হচ্ছে না তোমার ইত্যাদি।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তার মানে স্ত্রীকে ‘স্ত্রী’ না বানিয়ে এক অপারত ‘তুমি’ বানিয়েছ। কিন্তু...।’

সুষ্মিতা বালাজীর কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, ‘সুসি, ওকে তুমি আবার ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছ। কম্পিউটার এনে দিয়েছি, এখন আমাদের প্রশ্নের জবাব চাই।’

‘ধন্যবাদ ড্যানি।’

বলে আহমদ মুসার দিকে তাকাল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, ‘কম্পিউটার তো এসেছ। আগে প্রশ্নের জবাব দাও। তারপর কম্পিউটার হাত দিও।’

‘দু’টোই হবে।’

বলে আহমদ মুসা কম্পিউটাররের কি বোর্ডে হাত চালাতে লাগল।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর দৃষ্টি কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়, তাদের প্রশ্নের জবাবের সাথে কম্পিউটারের কি সম্পর্ক।

ইন্টারনেটে প্রবেশ করেছে আহমদ মুসা। সার্চ করা নয়, সবই যেন মুখস্ত তার। আহমদ মুসার আঙুল নড়ছে, সেই সাথে অবিরাম পাল্টে যাচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনের দৃশ্যে।

অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিমা বালাজী কম্পিউটারে স্ক্রীনের দিকে।

তারা দেখল, অস্থির কারসারটি এক সময় শিরোনামে একটি পয়েন্টে গিয়ে স্থির হলো। তারপর আহমদ মুসার তর্জনি একটা কীতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে ভেষে উঠল একটা ফটো। ফটোটাকে ধীরে ধীরে স্ক্রীন জোড়া করে তুলল আহমদ মুসা।

ফটো দখে চমকে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী। মুখ ফেঁড়েই যেন কথা বেরিয়ে এল সুষ্মিতা বালাজীর, 'এতো তোমার ফটো? ইন্টারনেটে কেন?'

প্রশ্ন করে থামল সুষ্মিতা বালাজী।

'ইন্টারনেটে তোমার 'ওয়েব সাইট' আছে নাকি?' সুষ্মিতার কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো প্রশ্ন।

'আমার কোন ওয়েব সাইট নেই। এটা মার্কিন 'সিআইএ'র একটি ওয়েব সাইট। শিরোনামঃ 'পরিবর্তনের নিয়াময় যারা' (Potentials of Change)।'

'সাংঘাতিক ব্যাপার। সিআইএ'র 'পটেনশিয়ালস অব চেইঞ্জ'-এ তোমার পরিচিতি দিয়েছে? দেখি।'

বলে সুষ্মিতা বালাজী চেয়ার টেনে এগিয়ে এলো কম্পিউটারের কাছে।

ড্যানিশ দেবানন্দও চেয়ার টেনে সুষ্মিতার পাশে বসল।

প্রথম ওয়েব পেশ খোলাই ছিল।

ছবির নিচেই জ্বল জ্বল করছে একটি নামঃ 'আহমদ মুসা।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখ আটকে গেল নামটার উপর।

বিষ্ময়ের এক ধাক্কা তাদের দু'জনের মুখেই আছড়ে পড়ল। কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাদের কপাল। নীরব দৃষ্টিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। নামটা দু'জনেরই চেনা। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তার সম্পর্কে

জেনেছে। সবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন সংকটে তার ঐতিহাসিক অবদা এবং টুইনটাওয়ার ধ্বংসের রহস্য উদঘাটনের শ্বসরুদ্ধকর কাহিনী তাদের সামনে রয়েছে। অনেক ঘটনার বিস্ময়কর সেই নায়ক আমাদের সামেনের এই লোকটি? তাকেই কি আমরা শত্রুর হাত থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে এনেছি। গর্ব ও তৃপ্তির শিহরণ খেলে গেল তাদের দেহে। তারা তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন জানালা দিয়ে বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে দেখা যাচ্ছিল নিচে উপত্যাকার সবুজ বনানীর উপর দিয়ে আন্দামান উপসাগরের নীল পানি। এই নৈসর্গিক দৃশ্যের কোন অন্তহীনের মধ্যে যেন ডুবে গেছে তার মন। একটা ধ্যানমগ্নতা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে। এ মানুষ তো পৃথিবীকে এবং এই পৃথিবীর সব মানুষকে শুধু ভালই বাসতে পারে। এই মানুষেরই হাতে প্রাণসংহারকারী বন্দুক গর্জন করে ওঠে কি করে!

ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে এবার বিস্ময়ের স্থানে ফুটে উঠল শ্রদ্ধার ভাব আর অনেক প্রশ্ন।

কিন্তু আহমদ মুসার ঐ ধ্যানমগ্নতা তারা ভাঙতে চাইল না। সুষ্মিতা বালাজী আবার চোখ ফেরাল কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে। ফটোর নিচেই আহমদ মুসার নাম। তারপরই শুরু আহমদ মুসার ডসিয়ার-তার জীবন ও কাজের বিবরণ।

ড্যানিশ দেবানন্দের চোখও ফিরে এসেছে কম্পিউটার স্ক্রীনে। তারও চোখ আহমদ মুসার ডসিয়ারের উপর।

‘এস ডসিয়ার দেখে নেই। সিআইএ’র ডসিয়ার দেখছি অনেক বিস্তারিত ও তথ্যবহুল।

‘হ্যাঁ, ঠিক।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সুষ্মিতা বালাজী ডসিয়ারের এক এক পেজ ওপেন করতে লাগল এবং পড়ে চলল। ড্যানিশ দেবানন্দও।

ওয়েব পেজ পড়া শেষ হলো। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ দু’জনেরই মুখ।

দু’জনেই মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাও মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে তাদের দিকে।

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিনতু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'মিঃ আহমদ মুসা, শ্রীকৃষ্ণ যদি এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াত, তাহলেও আমরা এত বিস্মিত হতাম না, যতটা বিস্মিত হয়েছি আপনাকে এইভাবে পেয়ে। কারণ, ভগবান ভক্তদের দর্শন দিতেই পারেন, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়া ছিল অসম্ভব, অকল্পনীয়। ওয়েলকাম আপনাকে।'

মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার। বলল, 'ওয়েলকাম জানাবার জন্যে 'আপনি' সম্বোধনের কি প্রয়োজন?'

'আহমদ মুসাকে 'তুমি' বলব আমরা কি করে?' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'বলুন আপনি আহমদ মুসার পিতা-মাতা, বড় ভাই, বড় বোননা কি তাকে 'আপনি' বলবে?'

'তা বলবে না।'

'তাহলে আপনি কি বড় বোন হতে অস্বীকার করছেন?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল সুষ্মিতা বালাজী। তার মুখে নেমে এল বেদনার ছায়া। তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'না, অস্বীকার করতে পারি না, এ ডাক কেউ প্রত্যাখান করতে পারে না।' আবেগের উচ্ছাছে আটকে গেল সুষ্মিতার বালাজীর শেষ কথাগুলো।

একটু থেকে নিজেকে সামলে, চোখে টলটলে অশ্রু নিয়ে মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, 'যাই বলুন, আপাতত 'তুমি' সম্বোধন মখে আসছে না এবং নাম ধরে ডাকতে পারবো না। ঠিক আছে?'

'না, এ আপোষ প্রস্তাবে না করা কিছু নেই।' বলে ড্যানিশ দেবানন্দ মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনাকে এভাবে পেয়ে বিষ্ময়ে যে শক খেয়েছি আমরা, তার চেয়ে কিন্তু বেশি বিষ্ময়কর মনে হচ্ছে আপনার আন্দামানে আসা। আপনি যখন এসেছেন, তখন ধরতেই হবে এখানে খুব বড় একটা ঘটনা ঘটছে। কিন্তু সেটা কি? মাত্র কয়েক ডজন লোক খুন হওয়া দু'একজন কিডন্যাপড হওয়া খুব বড় ঘটনা নয়, এমন ঘটনা বহুদেশেই এখন ঘটছে।'

গাম্ভীর্যের একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে। বলল, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ধরুন, ঐ নিহত লোকরা যদি একটা ধর্ম বিশ্বাসের হয়, কিডন্যাপপ লোকটিও যদি ঐ একই কম্যুনিটির হয়, তাহলে এর একটা ভিন্ন অর্থ হয় না?

বিস্ময় নামল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। কথা বলে উঠল সুস্মিতা বালাজীই প্রথম। বলল, 'তাম মানে নিহতরা সবাই মুসলামান।

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহল দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজাত।' সুষ্মিমা বালাজী বলল।

'শংকরাচার্য শিরোমনির মত লোকরা যখন এর সাথে জড়িত, তখন বিষয়টা যে উৎকট সাম্প্রদায়িক হবে সেটা অবধারিত।' আহমদ মুসা উত্তর দেবার আগেই বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আপনি ঠিক বলেছে ভাই সাহেব। বিষয়টা শুধু উৎকট সাম্প্রদায়িক নয়, সাংঘাতিকভাবে পরিকল্পিতিও। আপনি যেটা বললেন, ওরা আন্দামানের সেলুলার জেলের ইতহাস থেকে মুসলমানদের নাম মুছে ফেলতে চায়। ঠিক এভাবেই ওরা আন্দামান থেকেও মুসলমানদের বিশেষ করে সক্রিয়-সচেতন মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে দিতে চায়। এটাই মুল বিষয়, কিন্তু এর সাথে কিছু অনুসঙ্গ আছে।' বলল আহমদ মুসা।

'সে অনুসঙ্গটা কি?' প্রশ্ন সুষ্মিতা বালাজীর।

'আমি জানি না। তবে আমাদের গঙ্গারাম ওদের হাতে বন্দী থাকার সময় শুনেছিল, একটা মহামুল্যবান বাক্স নাকি তারা উদ্ধারের চেষ্টা করছে বড় শয়তান মানে আহমদ শাহ্ আলমগীরের কাছে থেকে। এই বাক্স উদ্ধারের জন্যে তারা যা করার তাই করবে।' আহমদ মুসা বলল।

'একটা বাক্স কি করে এই ধরনের একটা ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে? নিশ্চয় তাহলে বাক্সটা বড় কিছুর একটা অংশ।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'হবে হয়তো। আমি এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি।' আহমদ মুসা বলল।

সুস্মিতা বালাজী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করল রান্নার এ্যাপ্রন পরা একটি মেয়ে। তাকে দেখে থেকে গেল সুস্মিতা বালাজী। বলে উঠল মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, 'জারওয়া, সব রেডি?'

জারওয়া আদিবাসি মেয়ে। বলল ভাঙা হিন্দিতে, 'সব তৈরি মাতাজী।'

'যাও নিয়ে এস।' নির্দেশ দিল সুস্মিতা বালাজী।

মেয়েটি চলে গেল।

'বুঝতে পারলাম না মেয়েটি কোন আদিবাসি গ্রুপের?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'মিশ্র গ্রুপের। আমাদের এই উপত্যকা ও পাহাড়ে সেন্টেনেরিল ও জারওয়া গ্রুপের উপজাতিরা একসাথে এক সমজে বাস করে। বহুদিরে পারস্পরিক বৈবাহিতক সম্বন্ধের ফলে দু'গ্রুপের মিশ্রুণে তৃতীয় একটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'কিন্তু এমন তো শুনিনি। আন্দামান-নিকোবরের চারটি প্রধান উপজাতি গ্রুপই আলাদাভাবে আলাদা অঞ্চলে বাস কের। এদের মধ্যে কোনই সামাজিক সম্পর্ক নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'এটাই ঠিক ছোট ভাই। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা একটা ব্যতিক্রম। প্রাকৃতিক এক বিপর্যয় এভাবে এক করে দিয়েছে। অনেক বছর আগে ভয়াবহ এই সাইক্লোন উলট-পাঠল করে দিয়েছিল এই দ্বীপকে। পর্বতপ্রমাণ ঢেউ মানুষকে ভাসিয়ে নিয়েছিল এখান থেকে সেখানে। সেই ঢেউ ৫০ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে রেখে গিয়েছিল এই পাহাড়ে। এই পঞ্চশ জনের একটা অংশ সেন্টেনেলিস ও অপর অংশটা ছিল জারওয়া গ্রুপের। একসাথে মিলে-মিশেই এরা ঘর বাঁধে। এখন ওরা এক হয়ে গিয়েছে।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

সুস্মিতা বালাজীর কথা শেষ হতেই ট্রলি ঠেলে নাস্তা নিয়ে প্রবেশ করল জারওয়া।

ট্রলিটা এসে দাঁড়াল আহমদ মুসার খাট ঘেঁসে। ট্রলিতে একটা বড় ট্রে। ট্রেতে একদম শহরে নাস্তা-ব্রেড রোল, বাটার কিউব, গরম সুপ ওফরের জুস। তার সাথে কফি-চিনি-দুধের পট এবং তিনটি কাপ।

‘ছোট ভাই, আপনার সংজ্ঞা ফেরার আগে আমাদের নাস্তা হয়ে গেছে। আপনি নাস্তা করে নিন, আমরা কফি খাচ্ছি।’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।’

‘ধন্যবাদ। সত্যি ক্ষুধার্ত আমি।’

বলে আহমদ মুসা ট্রলির কাছে সরে এল। নাস্তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘সুপটা কিসের? ভেজিটেবল?’

‘না, চিকেন সুপ।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা সুপের বাটি সামে থেকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে ব্রেড-বাটার খেতে শুরু করল।

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী কাপে কফি ঢেলে নিয়ে খেতে শুরু করল।

‘এই গহীন জংগলে এমন টাটকা নাস্তা কি করে এল?’ আহমদ মুসা বলল।

‘গহীন জংগল হলেও এখান থেকে উত্তরে মায়াবন্দর এবং দক্ষিণে পাহলাগাঁও সমান দূরত্বে। আমাদের আদিবাসি লোকদের ঐ দুই শহরেই প্রতিনিদ যাতায়াত আছে। প্রতিদিনই সরবরাহ আনা হয় সেখান থেকে।’ বলল সুষ্মিতা বালাজঅ।

‘তাহলে মায়াবন্দর কিংবা পাহলাগাঁওয়ে না থেকে এখানে কেন? শংকরাচার্য ও পুলিশের ভয়েই কি?’ আহমদ মুসা বলল।

‘এটাই প্রথম কারণ। আমরা চেয়েছি, ঐ কশাই-কাপালিক ও পুলিশের ছায়া থেকে দূরে থাকতে। দ্বিতীয় কারণ হলো, এই উপপত্যকা, পাহাড় এবং পাহাড়ীদের আমরা ভালবেসে ফেলে।ছ। এদের নিয়েই আমাদের জীবন। এটাই আমাদের পৃথিবী।’ বলল সুষ্মিমা বালাজী।

আহমদ মুসা ব্রেড-বাটার-জুস খেয়ে কফির কাপ টেনে নিল।

‘সুপ যে থাকল ছোট ভাই। অনে রক্ত গেছে, আপনার জন্যে ওটা খুবই দরকার।’ সুষ্মিতা বালাজী বলল।

এক টুকরো সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোঁটে। বলল, 'স্যরি, মুরগির সুপ বলে খেতে পারছি না।'

'মুরগি খান না?' সুষ্মিতা বালাজী বলল।

'খাই। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে আল্লাহর নাম নিয়ে যদি জবাই করা না হয়, তাহলে মরগি, খাসি, গরু ইত্যাদি কোন প্রাণীরই গোসত আমরা খেতে পারি না।' বলল আহমদ মুসা।

বিষ্ময় ফুটে উঠল সুষ্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দ দু'জনের চোখে-মুখেই। কয়েক মুহূর্ত তারা কিছু বলতে পারল না। পরে সুষ্মিতা বালাজী বলল, 'আল্লাহর নাম নেয়া নয় বলেই এসব কোন কিছুই আপনি খাবেন না? কিন্তু এই নাম নেয়া না নেয়ার মধ্যে কি এমন এসে যায়?'

'আল্লাহর নাম না নেয়ার মধ্যে গোশতের গন্ধ, স্বাদ কিংবা ফিজিক্যাল কোন পার্থক্য হয়তো দৃশ্যমান নয়, কিন্তু সৃষ্টিগত দদি থেকে জীবনের সাথে এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।' আহমদ মুসা বলল।

'সেটা কেমন?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'এই বিশ্বজগতে যা আছে সকলেই আমরা আল্লাহর সৃষ্ট। সৃষ্টি হিসাবে গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ, মুরগি সকলেই আমরা সমান। তাহলে আমরা গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদিকে দেদার জবাই করে খাচ্ছি কেন, কোন অধিকারে? খাচ্ছি এই অধিকারে যে স্রষ্টা স্বর্য় এই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি বলয়কে চলমান, অব্যাহত রাখার জন্যেই এক সৃষ্টিকে আরেক সৃষ্টির ভোগ্য বানিয়েছেন। মানুষ খাবে মুরগি, মরগি খাবে পোকাড়মাকল, পোকাড়মাকল বাচঁবে আবার অন্যকিছু খেয়ে। এইভাবে সৃষ্টির সবাই বাঁচবে, সষ্টি-জগৎ থাকবে চলমান। সুতরাং আমরা যে গরু খাচ্ছি, মরগি খাচ্ছি, খাসি খাচ্ছি, তা আমাদের শক্তির জোরে খাচ্ছি না, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে খাচ্ছি। এই বিধানকে স্বীকৃতি দেয়া, স্মরণ করার জন্যেই ভোগ্য প্রাণীকে জবাই করতে আল্লাহত নাম নিতে হবে।' বলল আহমদ মুসা।

সুষ্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ যে গোগ্রাসে গিলছিল আহমদ মুসার কথা। তাদের স্থির দৃষ্টি আহমদ মুসার মুখের উপর। আর বিষ্ময়ে হা হয়ে

গেছে তাদের মুখ। আহমদ মুসা থামলেও তারা কথা বললো না। তাদের দৃষ্টি একইভাবে নিবদ্ধ থাকল আহমদ মুসার দিকে। তাদের শোনা যেন শেষ হয়নি। অথবা যেন হজম করছে আহমদ মুসার কথাগুলো।

আহমদ মুসা কফির কাপ তুলে নিয়ে একটু একটু চুমুক দিচ্ছিল গরম কফিতে।

নীরবতা ভাঙল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'ধন্যবাদ ছোট ভাই, আপনি অপরূপ এক সৃষ্টি-দর্শন সামনে নিয়ে এসেছেন। জীবন ধারণের জন্যে একে-অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা নির্ভরশীল সৃষ্টি বলয়ের কথা আমরাও জানি, কিন্তু এর সাথে স্রষ্টার ইচ্ছা বা বিধানকে যুক্ত করে একে যে অপরূপ করে তুললেন, সেটা বিষ্ময়কর শুধু নয়, তা জীবনের এক নতুন অর্থ সামনে নিয়ে আসে।'

বলে একটা দম নিল সুষ্মিতা বালাজী। একটু ভাবল। তাপর বলল, 'কিন্তু বলুন স্রষ্টার নাম নিয়ে তার বিধানকে স্বীকৃতি না দেয়া, বা স্বরণ না করার মধ্যে ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে? আইন বা সিষ্টেম হিসাবে কেন এ বিষয়টাকে অপরিহার্য করে নিতে হবে।'

'আল্লাহর এই ইচ্ছা ও বিধানকে স্বরণ করা বা স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে বড় লাভ হলো,পৃথিবীতে আমরা ভোগ দখলের ক্ষেত্রে আমার শক্তিকে আমি আমার ক্ষমতাকে বড় করে দেখছি না, নিয়ামক ভাবছি না বরং আল্লাহর দেয়া অধিকার হিসেবেই ভোগ দখল করছি। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ গ্রহণ করলে, জীবনের সবক্ষেত্রেই সে এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করবে। সবক্ষেত্রেই সে আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান তালাশ করবে। এই জীবন-দর্শন যখন কোন মানুষের অনুসরণীয় হয়ে যায়, তখন মানুষ কেন কোন পশু-পাখিও তার দ্বারা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আল্লাহর কোন ইচ্ছা বা আইনকে সে লংঘন করে না, কোন অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেয় না, কোন জুলুম অত্যাচারেও সে শামিল হয় না।' থামল আহমদ মুসা।

সুষ্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখে-মুখে নতুন বিষ্ময়-বিমুগ্ধতা। আহমদ মুসা থামতেই কথা বলে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ, 'ছোট ভাই সাহেব, তিল তো দেখি একেবারে তাল হয়ে গেল। শুরু হয়েছিল মুরগির গোশত খাওয়া না খাওয়া নিয়ে, কিন্তু আপনি পরিণত করলেন একটা জীবন-দর্শনে। আর

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কোন ধর্মীয় মঞ্চ থেকে ধর্মবেত্তা কোন দার্শনিক বক্তৃতা দিচ্ছে। যাক, এখন বলুন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধানকে স্মরণ করা বা স্বীকৃতি দিলে কোন আইন কেউ লংঘন করবে না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, জুলুম-অত্যাচারে শামিল হবে না এমন লোক তৈরি হবে, এটা কি বাস্তব?'

'খুবই বাস্তব। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধানকে নিখুঁতভাবে মেনে চলছে তাদের গোটা জীবনে। সকল অংগ-প্রত্যাংগসহ। মানুষের দেহও একইভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলে। মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে, কি বলবে কি বলবে না, কি করবে কি করবে না, কি খাবে কি খাবে না, ইত্যাদি কর্মমূলক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রেই শুধু মানুষকে স্বাধীনাতা দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। এই স্বাধীনতা দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ মানুষকে বলে দিয়েছেন যে, তিনি জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্যে যে মানুষ সৎকর্মশীল হয় কিনা।' সৎকর্মশীল হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান অনুসারে কিংবা বিবেকের নির্দেশ অনুসারে চলা। এভাবে চলা সম্ভব, অবাস্তব নয়। শুধু প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

সুষ্মিতা বালাজী মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'এই দৃষ্টিভংগির পরিবর্তনটা কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা বিধানকে মেনে চলা?'

'এই মেনে চলাটা কাজ, দৃষ্টিভঙ্গির ফল। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জীবন জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা।' এই ধারণা আজ বিভিন্ন রকম।' আহমদ মুসা বলল।

'যেমন, মানুষ কর্মফল অনুযায়ী পুনর্জন্ম হওয়া, দুনিয়ার জীবনই সব-এর আগেও কিছু না পরেও কিছু নেই, যিশু সকল পাপের দায় নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এবং সে কারণে যিশুর অনুসারীর স্বর্গ নিশ্চিত, ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন তো ছোট ভাই?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'হ্যাঁ। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই জীবনের কাজ-কর্ম নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে জীবনের কাজ-কর্ম সঠিক হবে ও কল্যাণকর হবে সকলের জন্যেই।' বলল আহমদ মুসা।

'ছোট ভাই, আপনি বলছেন দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে জীবনের কাজকর্ম সঠিক হবে। তার মানে সব দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। তাহলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে বাছাই হবে, কে বাছাই করবে?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল ।

'একটা প্রবাদ আছে, নিজের ভাল পাগলেও বুঝে। স্রষ্টার দেয়া মানুষের এটা একটা বিশেষ গুণ। আল্লাহর দেয়া এই বিশেষ গুণ বা শক্তির নাম বিবেক। মানুষের এই বিবেকই বলে দেয় কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা কল্যাণকর, আর কোনটা অকল্যাণের। মানুষের বিবেকের এই শক্তিই বলে দিতে পারে, জীবনের কোন দৃষ্টিভঙ্গিটি তার জন্যে ভাল, কল্যাণকর।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝলাম ছোট ভাই, কিন্তু কল্যাণকর বা করণীয় হিসাবে আপনি 'স্রষ্টার ইচ্ছা বা বিধান' এবং 'বিবেকের বাছাই' দুই দিকেরই উল্লেখ করেছেন। অথচ সত্য ও কল্যাণ একটাই হবে, একদিকেই থাকবে, এর দুই রূপ হতে পারে না।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু স্রষ্টার ইচ্ছা ও বিধান' এবং 'বিবেক' দুই জিনিস নয়। বিবেক স্রষ্টার দেয়া। এর বাছাই আল্লাহর 'ইচ্ছা ও বিধানের' পরিপন্থী হয় না। শুধু মাধ্যম হিসাবে আলাদা। আল্লাহর সৃষ্ট ভাল-মন্দ বাছাইয়ের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা।' বলল আহমদ মুসা।

'নবী-রসূল মানে ডিভাইন মেসেঞ্জারদের কথা বলছেন, ধর্মের কথা বলছেন। ডিভাইন মেসেঞ্জারদের মাধ্যমে ধর্মের আকারে স্রষ্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আইন-বিধান আসছে, বিবেকের আবার প্রয়োজন কি?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'দু'য়ের উদাহরণ অনেকটা অর্জিত শিক্ষা ও কমনসেন্সের মত। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়, কিন্তু অশিক্ষিতের একটা কমনসেন্স থাকে, যা দিয়ে সে ভালো-মন্দের বাছ-বিছার করে জীবন পরিচালনা করতে পারে। নবী-রসুলরা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের জন্যে জীবন-যাপন প্রাণালী বা জীবন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। মানুষ তাদের কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করে সৎ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু যারা নবী-রসূলদের সাক্ষাত পায়নি কিংবা তাদের শিক্ষা লঅভের সুযোগ হয়নি, তাদের ভাল থাকার, ভাল করার উপায় হিসাবেই ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ মনে করার কমনসেন্স বিবেককে বিধিবদ্ধভাবেই নেয়া হয়েছে,

যাতে করে আল্লাহ 'জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্যে যে মানুষ সত্যিই কর্মশীল হয় কি না'- এই পরীক্ষা সবার ক্ষেত্রে হয়ে যায়।' থামল আহমদ মুসা।

গভীর ভাবনার ছায়া ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা কথা বলল না।

ওরা তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

নীবরতা ভাঙল ড্যানিশ দেবানন্দই। বলল, 'ছোট ভাই, এই কয়েক মিনেটে আপনার কাছ থেকে যা শিখলাম, কয়েক দিন, কয়েক মান আপনার সাথে পেলে জীবন সম্পর্কে সত্যিই পণ্ডিত হয়ে যাব। কিন্তু বলুন ভাই, জানতাম আপনি জগৎ কাঁপানো একজন বিপ্লবী, বন্দুক-গোলা-বারুদ আপনার সাথী, সংঘাত-সংঘর্ষ আপনার প্রতিদিনের রুটিন কাজম সেই আপনাকে দেখছি ধর্মবেত্তা এক পরম ভাববাদী রূপে। আল্লাহর নাম না নিয়ে জবাই করলে আপনি সে মুরগি খান না। মানে আপনার ধর্মের প্রতিটি আদেশ নিষেধ আপনি সিরিয়াসলি মেনে চলেন। তা মানে আপনি একটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেচেন নিজেকে, আর আপনার বৃহত্তর মানুষ পরিচয়কে পরিত্যাগ করেছেন। আপনার মত বিপ্লবী এটা কিভাবে পারলেন?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মানুষ একটা প্রজাতির নাম, বলা যায় পশু প্রজাতির অংশ। নিছক এই প্রজাতি হিসাবে মানুষের রূপ-রস-গন্ধ কিছুই নেই, মানুষ প্রকৃত পক্ষে এই অবস্থায় মানুষ হয় না। মানুষকে মানুষ হবার জন্যে তার পশু-প্রবৃত্তির উপর তার মানবিক যুক্তিবাদিতাকে প্রভাবশীল করে জীবনকে তার পরিচালনায় একে নিয়ন্ত্রকের আসতে বসাতে হবে। এই মানবিক যুক্তিবাদিতা কতকগুলো নিয়ত-নীতি-মূল্যবোধের নাম, কতকগুলো আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থার নাম। এইগুলো মানুষ লাভ করে নবী-রসুলদের মাধ্যমে আসা বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান থেকে। মানুষ যখন মানুষ হবার জন্যে এই মানবিক যুক্তিবাদিতা বা মানবিক জীবন বিধান গ্রহণ করে তখন তার আরও একটি নাম হয়ে যায়। আমি এ ধরনের একটা নাম গ্রহণ করছি। এর দ্বারা আমি

মানুষ পরিচয়কে পরিত্যাগ করিনি, বরং আমার পশু প্রবৃত্তিকে হটিয়ে সেখানে মানবিক যুক্তিবাদিতাকে বসিয়ে আমার মানুষ পরিচয়কে পূর্ণ করেছি।'

ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর দু'জনের চেহারাতেই বিস্ময়-বিমুগ্ধতা। আহমদ মুসা থামলে এবার কথা বলে উঠল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'চমৎকার ছোট ভাই, চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। ভেবেছিলাম এবার আপনি আটকা পড়বেন। এই মোক্ষম প্রশ্নটার কোন জবাব নেই বলেই জানতাম। এমন অকাট্য পশ্নের কোন যৌক্তিক জবাবই হতে পারে না। কিন্তু এখন আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে প্রশ্নের চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি যৌক্তিক ও সংগত আপনার জবাব। আপনার কথা শতভাগ সত্য। শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কার-সামাজিকতার স্পর্শহীন আবহমান বনচারী একজন মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্কথ্য খুবই কম। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা-মূল্যবোধ তাকে সত্যিকার মানুষ করে তোলে এবং তখন তার মানুণ নাম ছাপিয়ে তার নতুন পরিচয় জ্ঞাপক নাম মূখ্য হয়ে ওঠে। যেনম ভারতীয়, আমেরিকান।'

'না, হলো না আপা।' আহমদ মুসা বলল।

'কি হলো না বলছেন?'

'উদাহরণটা ঠিক হয়নি। ভারতীয়, ইন্ডিয়ান এসব রাজনৈতেক পরিচয় জ্ঞাপক নাম। রাজনৈতিক পরিচয়ের পার্থক্যে কিন্তু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পার্থক্য ঘটে না। যেমন একজন জার্মান ও একজন ফরাসির মধ্যে মূল্যবোধ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু একজন জার্মান ও একজন তুর্কির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। একজন জার্মান ও একজন ফরসীর মধ্যে পার্থক্য না থাকার কারণ তারা উভয়েই ক্যাথলিক খৃষ্টান, আর একজন তুর্কি ও একজন জার্মানের মধ্যেমার পার্থক্যের কারণ জার্মানীরা ক্যাথলিক তুর্কিরা ইসলামী ধর্মমতে বিশ্বাসী। আর একটা কথা, দু'জার্মানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হতে পারে যদি দু'জার্মান দু'ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়।' আহমদ মুসা বলল।

'তার মানে দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধগত পার্থক্যের নিয়াকম হলো 'ধর্ম?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'ঠিক ধরেছেন আপা।'

'তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে, ধর্মবোধই 'পশু-মানুষ'কে মানবিক 'মানুষে পরিণত করে, তাই কি? নিশ্চয় আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হবে। কিন্তু একটা ছোট্ট প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষের সহজান 'বিবেক' বা কমনসেন্স কি মানুষকে মানুষ বানাতে পারে না? আপনিই তো বিবেককে ঈশ্বরের দেয়া ভাল-মন্দ বাছাইয়ের একটা শক্তি বলেছেন।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'হ্যাঁ নিছক বিবেক বা কমনসেন্স যদি পশু মানুষকে 'মানবিক মানুষ' বানাতে পারত, তাহলে ঈশ্বর বা আল্লাহ এবং তার নবী-রসূলেদের আর দরকার হতো না, সহজেই দর্মনিরপেক্ষা হওয়া যেতো। কিন্তু তা সম্ভব নয় ভাই সাহেব। বিবেক বা কমনসেন্সের কাজ বিরাট, কিন্তু তার কাজের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। বিবেক তার স্বভাব-প্রকৃতির মাধ্যমে ভালকে ভাল বলে, খারাপকে খারাপ বলে, এমনকি আল্লাহর প্রয়োজন অনুভব করে কোন কিছুকে ঈশ্বর বানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মানব জীবনের জন্যে মানিবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধভিত্তিক একটা সিস্টেম বা সংবিধান দাঁড় কারাতে পারে না। নবী-রসূলদের অভাবে জংগলবাসী মানুষের বিবেক যেমন একটা পারেনি, নবী-রসূলদের অস্বীকার করে নগরবাসী সভ্য মানুষ কার্লমার্কস, এঞ্জেলস ও মাওসেতুং-এর বিবেকও তেমনি তা পারেনি। এ সিষ্টেম বা ধর্ম আসে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে নবী-রসূলদের মাধ্যমে।

সুষ্মিতা বালাজীদের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি এবং মুখে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল হাসি।

'সমস্যার সাংঘাতকি একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ছোট ভাই। আপনার দৃষ্টান্তও চমৎকার। আপনার যুক্তি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বলুন তো, আপনার ব্যস্ত জীবনে এসব জটিল বিষয়ে চিন্তা করেন কেন, সময়ই বা কখন পান?'

'যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধকে আমার জীবন-পথের সিস্টেম বা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি, আমার কাজ সে ধর্মেরই অংশ। সুতরাং আমার এই চিন্তা আমার কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।' আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই। এই জবাব আপনি দেবেন তা আগেই বুঝেছি। বুঝতে পারছি আপনি খুবই মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মানুষ। আপনি আপনার ‘ধর্ম’ ইসলামকে আপনার জন্যে বাছাই করেচেন, না উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন বলে গ্রহণ করেছেন?’ জিজ্ঞাসা সুষ্মিতা বালাজীল।

‘আমি জন্মসূত্রে ইসলাম পেয়েছি। আমার আজকের বাছাইতেও ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার এই বাছাই পক্ষপাতদৃষ্ট হওয়াই তো স্বাভাবিক।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী। তার মুখে হাসি।

‘বাছাই সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার বাছাইটা ‘সত্য’ সন্ধানের জন্যে হলে, তাতে তখন পক্ষপাতের প্রশ্ন আসে না। এমনিভাবে প্রত্যেককেই সত্যকে যাচাই-বাছাই করে বের করে আনতে হবে। সত্য সব সময় একটাই হয়। সুতরাং সত্য সন্ধান যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে সবাই আমরা এক সময় এক জায়গায় এসে দাঁড়াব।

সুষ্মিতা বালাজী মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে চোখ দু’টি বড় করে তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, ‘শুনেছ ছোট ভাই কি ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝেছ?’

‘বুঝব না কেন? সত্য যেহেতু একটাই, এখন তার ধর্ম যদি সত্য হয় তাহলে এক জায়গায় গিয়ে না দাঁড়িয়ে উপায় কি!’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। তার মুখেও কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

সুষ্মিতা বালাজী মুখ ঘুরাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘আপনার ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করেন?’

‘না করলে আমি গ্রহণ করেছি কেন?’

‘তাতো ঠিক।’ বলল সুষ্মিতা বালাজী। একটু থামল। থেমেই আবার বলে উঠল, ‘সত্য বললেই তো হলো না। সবাই তার ধর্ম সত্য বলবে। সত্য যাচাইয়ের একটা মাপকাঠি তো থাকতে হবে। সেটা কি?’ সুষ্মিতা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাকে।

'মানব জীবনের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের বিচারে মানুষের জন্যে এমন একটি ধর্ম বা জীবন পদ্ধতি দরকার। যা হবেঃ

ক. মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনার একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা।

খ. মানুসের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল সার্বিক শান্তি ও কল্যাণের ব্যবস্থা।

এখন এক এক ধর্মকে সামনে নিয়ে দেখুন, কোন ধর্ম উপরের দুটি শর্ত পুরণ করতে পারে।' আহমদ মুসা বলল্

'ছোট ভাই, খুঁজে এ শর্ত দুটি কোত্থেকে বের করলেন? আপনার দ্বিতীয় জটিল শর্ত পূরণ তো পূরের কথা, প্রথম শর্তই আমার জানা কোন ধর্ম পূরণ করতে পারে না। যেমন আমাদের হিন্দু ধর্ম। আমাদের ধর্মে পূজা-পার্বনের কিছু নীতি-নিয়ম, ব্রাক্ষ্মণ-দেবতার কিছু ফাংশন ছাড়া মানুষের জন্যে মান্য বা করণীয় কিছুই সেখানে নেই। খৃষ্ট ধর্মে ৭দিনে ১দিন গীর্জায় যাওয়া ছাড়া মানব জীবন পরিচালনায় কোন নীতি ও বিধান নেই। বৌদ্ধ ধর্মতো জীবন বিমুখ ও নির্বাণে বিশ্বাসী। ইহুদী ধর্ম তো বণী ইসরাইল ছাড়া আর কারও পালনীয় নয়, আর এখানেও জীবন পরিচালনার সার্বিক বিধান অনুপস্থিত। শুধু ইসলামকেই সক্রিয় ও কর্মের ধর্ম বলে মনে হয়। আমি বিস্তারিত জানি না। আপনিই বলতে পারেন আপনার এই ধর্ম ঐ শর্ত দু'টি পালন করে কিনা।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

আহমদ মুসা মুখ খোলার আগেই সুষ্মিতা বালাজী দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, 'ড্যানি, তুমি তো ছোট ভাইয়ের ধর্মকে 'ওয়াক ওভার' দিয়ে দিলে। আর বাকি থাকল কি?'

আহমদ মুসা কফির কাপ ট্রেতে রেখে হাসি মুখে বলল, 'তাহলে আমি আর নিজের ঢোল নিজে বাজাব না। আপনারাই বরং আরও অনুসন্ধান করুন, জানুন।'

'আপনাকে আর ঢোল পেটাতে হবে না। ড্যানি যেটুকু পিটিয়েছে তাই যথেষ্ট। বাকির জন্য ওয়েব সাইট আছে। অনেক বলেছেন, আর কথা নয়। রেষ্ট নিন।'

বলে সুস্মিতা বালাজী ট্রেতে সব কাপ, বাটি সাজাল। তারপর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'আপনার মুরগি ও অন্যান্য গোশত খাওয়া দরকার। এখন কি করলে খেতে পারবেন তাই বলুন।'

'আপনারা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করুন। গরু-খাসি যারা জবাই করে, তাদের আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করতে বলুন।'

'কি বলতে হবে লিখে দিন। মুরগি আমরাই জবাই করব। গরু-খাসির ব্যবস্থাও করব।'

বলে কাগজ-কলম এগিয়ে দিল আহমদ মুসাকে সুস্মিতা বালাজী।

'একটা কাগজে আহমদ মুসা লিখল, 'বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর'। বলল, 'এই বাক্যটি বাই-এর সময় তিনবার বলতে হবে।

'বাক্যটির অর্থ বলুন।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'অর্থ হলো, 'আল্লাহর নামে মুরু করছি। আল্লাহ সর্ব শ্রেষ্ঠ।'

হাসল সুস্মিতা বালাজী। বলল, 'তাহেল আল্লাহকে তো স্বীকৃতি দিয়েই দিলাম। মুসলমান হয়ে যাবো না তো আবার এই কথা বললে?'

'অবশ্যই। কিন্তু ক্ষতি নেই। তুমিও ওয়াকওয়ার দিয়ে যাও।' টিপ্পনি কাটল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'না, অতটুকুতে কেউ মুসলমান হয় না। অতএব ভয় নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'ড্যানি, তুমি না জেনে ওয়াকওভার দিয়েছ। আমি তা করব না। দেখি ওয়েব সাইটে আজ থেকেই পড়াশুনা শুরু করব।'

বলে 'ট্রে' নিয় উঠে দাঁড়াল সুস্মিতা বালাজী। বলল আহমদ মুসাকে, 'ভাই এখন শুয়ে পড়ুন। কাল সকল থেকে একটু করে হাঁটতে পারেন, আজ নয়।'

চলা শুরু করে ড্যানিশ দেবানন্দকে লক্ষ্য করে বলল, 'ড্যনি তুমি বাড়িতে থাক। আমি রোগীটাকে দেখে আসি।'

'তাহলে তুমি খোঁজ নিয়ে এস ঐ এলাকার কোন নতুন লোক দেখা গেছে কিনা। নিশ্চয় ওরা আসবে। লোকেরা যেন চোখ রাখে।

'ঠিক আছে।'

বলে নাস্তার ট্রে নিয়ে ভেতরে চলে গেল সুষ্মিতা বালাজী।

‘ঠিক বলেছেন ভাই সাহেব, ওরা না এসে পারে না।’

‘চিন্তা নেই। ঐ এলাকায় আমাদের লোকেরা চোখ রাখছে?’

বলে উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, ‘ছোট ভাই আপনি শুয়ে পড়ুন। দেখি সুষ্মি বেরুল কিনা। আর একটা কথা বলতে হবে তাকে।’

ড্যানিশ দেবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আহমদ মুসা না শুয়ে কম্পিউটারের দিকে ঘুরে বসল। তার ডান হাতটা এগুলো কম্পিউটারের ‘কী’ বোর্ডের দিকে।

# ৪

সুস্মিতা বালাজীদের বাড়ির বাইরে সুন্দর বাগান।

বাগানে বসার জন্য বাঁশের তৈরি ছোট ছোট মাচা অনেক গুলো।

তারই একটি মাচায় বসে আহমদ মুসা।

তার সামনে একটা মাচায় পাশা-পাশি বসে সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ।

তাদের চারদিকে উপত্যকা, পাহাড় ও সাগরের অপরুপ দৃশ্য।

বিশাল উপত্যকাটা উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড় ঘেরা। আর পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে সুনীল সাগর। মাঝখানের গঠন অদ্ভুত সুন্দর। পাহাড়ের প্রান্ত ঘেঁসে পাহাড় ও উপত্যকার মাঝ দিয়ে তিন দিক জুড়ে প্রলম্বিত খাল আকারে গভীর খাদ। মাঝখানে উচ্ছ সমভূমি। সমভূমির তিন দিক ঘেরা গভীর খাল। বছরের অধিকাংশ সময়ই এটি পানিতে ভর্তি থাকে। পাহাড় ও উঁচু সমভূতি থেকে বৃষ্টির গড়ানো পানি খালের পানির উৎস। মাঝখানের উঁচু সমভূমি কয়েক বর্গমাইল আয়তনের হবে। সমভূমিটির প্রতিটি ইঞ্চি জমি জুড়ে উঠেছে বাগান ও শস্যক্ষেত। যখন বৃষ্টি কম থাকে, তখন তিন দিকের খাল থেকে সমভূমির ক্ষেতে পানি সেচ চলে। সুখী এই উপত্যকার মানুষ।

এই উচ্চভূমি উপত্যকার মাঝখানে এক টিলার উপর ড্যানিশ দেবানন্দের বাড়ি।

বাড়িটি উপত্যকাটির মধ্যমণি। আদিবাসীরা ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীকে যেন মূর্তিমান ভগবান হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের গোটা জীবন পাল্টে গেছে। তারা মাছ আর পশু শিকার করে জীবন যাপন করতো। তারা এখন আধুনিক চাষাবাদ শিখেছে, অনেক ধরনের কুটির শিল্পের মালিক। তাদের কেউ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না। আন্দামানের আদিবাসীদের সংক্যা অব্যাহতভাবে কমে যাওয়া তাদের ভাগ্যে লিখা। কিন্তু গত বিশ বছরে এই উপত্যকার

আদিবাসীদের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার জন্যে তাদের স্কুল হয়েছে।

ড্যানিশ দেবানন্দদের বাড়ি থেকে গোটা উপত্যকা নজরে আসে। নীল আকাশের নিচে নীল সাগরের সফেদ ঢেউয়ের মিষ্টি শব্দে শিহরিত সবুজ পাহাড় ঘেরা সবুজ উপত্যকার শান্ত-সুন্দর দৃশ্য কয়েকদিনে আহমদ মুসার সব ক্লান্তি, ব্যাথা, বেদনা মুছে দিয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করছে আহমদ মুসা।

মাচায় বসা আহমদ মুসা, ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর মধ্যে কথা চলছিল।

কয়েকদিন থেকেই আহমদ মুসা ওদের কাছ থেকে জংগল জীবনের কাহিনী শুনছে।

আজ কথা শুরু হলেই সুস্মিতা বালাজী বলে ওঠে, ‘আমাদের কথা শেষ, এবার আপনার কথা শুরু।’

‘আমার কাহিনী তো ইন্টারনেটে দেখেছেন আপনারা। আমি যা বলব সবই তো ওখানে আছে।’ উত্তরে বলল আহমদ মুসা।

‘না ওখানে কিছু ঘটনার কথা আছে, আপনার জীবনের কথা নেই। আমরা আপনাকে জানতে চাই।’ বলল সুস্মিতা বালাজী । বলে সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করেছিল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলেছিল এই আলোচনা। মুখে হাসি নিয়ে সুস্মিতা বালাজী তার প্রশ্ন শুরু করেছিল। কিন্তু উত্তর শুনতে শুনতে বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল সুস্মিতা বালাজী এবং ড্যানিশ দেবানন্দ দু’জনেই। এক সময় সুস্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘ছোট ভাই, আপনি স্মৃতির এত দুর্বহ ভার বয়ে বেড়ান।’ কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল সুস্মিতা বালাজীর।

প্রশ্ন শুনে ম্লান হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘সামনে তাকিয়ে আমি পথ চলি, পেছন ফিরে তাকাই না। তাই মনেও পড়ে না কিছু, তার ফলে কোন ভারও বইতে হয় না।’

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল সুস্মিতা বালাজী, ‘দেখুন, আমি ডাক্তার। আমাকে সাইকোলজীও পড়তে হয়েছে। মানুষের পথ চলা এবং তার জীবন এক জিনিস

নয়। স্মৃতিকে সামনে আনার জন্যে পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। এমনকি এ ব্যাপারে কোন ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তেরও প্রয়োজন পড়ে না। অজান্তেই স্মৃতি সামনে এসে যায়। আর আজ আপনি যত কথা বলেছেন, তা আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে বলেননি কিংবা নিছক আমাদের প্রশ্নের উপলক্ষে আসেনি। আপনি নিশ্চয় উপলদ্ধি করেছেন, আপনি যেন কথা বলছেন না, স্মৃতিগুলো যেন নিজেই কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল।

আহমদ মুসার মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল। একটু দেরিতেই মুখ তুলল। গম্ভীর তার মুখ। বলল, 'সত্যিই আপা, আপনাদের এই অপরূপ উপত্যাকার এই সুন্দর মুহূর্ত আমাকে তাজিক সীমান্তে দুর্গম পাহাড়ের এমনি আর এক উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল। সেটা ফাতেমা ফারহানাদের গ্রাম। আমি হঠাৎ বর্তমানকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, অততে হয়ে উঠেছিল বর্তমান। স্মৃতিটাই যেন আমার জীবন হয়ে উঠেছিল।' ভারী কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'অতীত হঠাৎ বর্তমান হয়ে উঠেছিল তা আসলে নয়, বর্তমানের সাথে অতীত সব সময় আপনার স্মৃতিতে হাজির আছে। স্মৃতি বর্তমানেরই একটা অংশ। আপনি এবার যখন ভাবি জোসেফাইন ও আহমদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে তাতিয়ানার কবর জিয়ারতে গিয়েছিলেন, কিংবা মেইলিগুলির কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছিলেন, তখন আপনার সামনে ফাতিমা ফারহানাদের কবর ভেসে ওঠেনি? উঠেছিল। এভাবেই অতীত বর্তমানের সাথে জড়াজড়ি করে বাস করে। আপনি পেছনে ফিরে তাকাতে চান না- আপনি স্মৃতিকে ভয় করেন বলে নয়, স্মৃতি আপনার অতি প্রিয় বলেই। কিন্তু আপনি এই বিষয়টাই চেপে রাখতে চান। আসলে প্রকৃতিগতভাবেই আপনি অত্যন্ত কোমল মানের মানুষ।' থামল সুস্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা আনমনা হয়ে পড়েছিল। চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিল তার দেহ।

সুস্মিতা বালাজী বুঝতে পেরেছিল আহমদ মুসা অতীত থেকে ফিরে আসতে পারেনি। সুস্মিতা বালাজী এখানে এসে তাদের দীর্ঘ আলোচনার ইতি টানতে চাইল। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে বলে উঠল, 'বলেছিলেন না মোবাইল কাথাও টেলিফোন করবেন?'

‘হ্যাঁ, ঠিক আমাকেও তো বলেছিলেন। খুব জরুরি নাকি টেলিফোন!’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সম্বিত ফিরে পাওয়ার মত চকিতে মুখ তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘ঠিক ভাই সাহেব, জরুরি টেলিফোন। গত কয়েকদিনে কয়েকবার টেলিফোন করেছি, পাইনি।’

সুষ্মিতা বালাজী পকেট থেকে মোবাইল বের করে এগিয়ে দিল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘সেটটা আপনি রেখে দিন। আমি আরেকটা যোগাড় করেছি।’

‘ধন্যবাদ’ বলে আহমদ মুসা মোবাইলটি হাতে নিল।

সঙ্গে সঙ্গেই টিপল নির্দিষ্ট নাম্বারগুলো।

কানে তুলে ধরল মোবাইল।

নাম্বারটিতে রিং হচ্ছে।

ওপারের উত্তরের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা।

ওপার থকে ‘হ্যালো’ শব্দ ভেসে এল। নারী কণ্ঠের।

আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ সমুসার। বলল দ্রুত কণ্ঠে, ‘সুষমা রাও বলছ?’

‘ভাইয়া? আপনি? আপনার কোন খবর নেই কেন? কোথায় আপনি? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।’ কান্নায় জড়িয়ে গেল সুষমা রাওয়ের কণ্ঠ।

‘কি হয়েছে সুষমা?’ কাঁদছ কেন? বল কি হয়েছে?’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠ আহমদ মুসার।

‘সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইয়া। গত রাতে শাহ্ বানুদের কে বা কারা কিডন্যাপ করেছে।’ কাঁদতে কাঁদতে বলল সুষমা রাও।

‘কি বলছ সুষমা, কিডন্যাপ করেছে? কিভাবে? সংরক্ষিত গভর্নর ভবনে বাইরেরে কেউ ঢুকবে কি করে?’

‘ভাইয়া, চারজন প্রহরীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে।’ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল সুষমা রাও।

‘কিন্তু রাতের বেলা তো তোমাদের বাড়ি থেকে মেইন রোড পর্যন্ত সড়কটায় গভর্নর হাউজের ষ্টিকার বিহীন ও পুলিশের গাড়ি ছাড়া অন্যসব গাড়ির চলাচল বন্ধ থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আমি কিছু জানি না ভাইয়া। আপনি আসুন।’ বলল সুষমা রাও।

‘তোমার আব্বা কি বলছেন? পুলিশ কি করছে?’ আহমদ মুসা বলল। কুঞ্চিত আহমদ মুসার কপাল। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া।

‘বাবা বলেছেন, পুলিশ খুঁজে বের করবে। পুলিশ চারদিকে খোঁজ করছে। কিন্তু পুলিশ কিচুই করতে পারবে না, করবেও না, এসব আপনি জানেন ভাইয়া। আপনি আসুন। আপনি কেন ক’দিন খোঁজ খবর নেননি? কেন আপনার মোবাইল বন্ধ?’

‘আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে অনেক দূরে। মোবাইল আমার কাছে নেই। আমি আসছি সুষমা। তুমি ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি আসুন ভাইয়া। বাই। সালাম।’

ওপার থেকে মোবাইল বন্ধ হয়ে গেল।

আহমদ মুসা মোবাইল বন্ধ করতেই সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দ একসাথে বলে উঠল, কি ঘটেছে, কে কিডন্যাপ হয়েছে?’

‘আমি আপনাদের বলেছিলাম, আহমদ শাহ্ আলমগীরের বোন শাহ্ বানু এবং তাদের মা সাহারা বানুকে এক নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছিলাম। সেখান থেকে ওরা কিডন্যাপ হয়েছে।’

‘সুস্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখ-মুখ উদ্বেগের অন্ধকারে ছেয়ে গেল। কোন কথা তাদের মুখে যোগাল না।

আহমদ মুসা ভাবছিল। একটু পর মুখ তুলল। বলল সুস্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে, ‘আপা আপনার মামা বিবিমাধন সুষমার প্রেমিক আহমদ আলমগীরকে বন্দী করে রাখতে পারলে তা মা বোনকে কি কেউ মেয়ের আশ্রয় থেকে অপহরণ করতে পারে না।?’

সুস্মিতা বালাজী বিষণ্নতায় ডুবে গেল। সাথে সাথে উবে গেল তা মুখ থেকে সেউ উচ্ছ্বল আনন্দ। সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু কলল, ‘আপনার এ প্রশ্নের জবাব আমার জীবনেই আছে। কিছুই অসাধ্য তাদের নেই।’

‘আমি শুনতে পারি সে কাহিনী।’ বলল আহমদ মুসা।

ম্লান হাসল সুস্মিতা বালাজী। বলল, ‘আমি মহারাষ্ট্রের বালাজী পরিবারের ব্রাক্ষ্মণ কন্যা। বিয়ে করি পার্সি ছেলেকে। যদিও সে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, তাতে কোন ফল হয় না। আমার গোটা পরিবার আমাদের পরিত্যাগ করে। মামারাই ক্ষুব্ধ হন বেশি। বোম্বাই-এ মামা থাকতেন। তাঁর বাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া করতাম। সুষমার এক বছর বয়স পর্যন্ত একসাথে ছিলাম। তারপেরেই আমি বিয়ে করি। বিয়ের পর একবছর ছিলাম আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে। তারপরেই শুরু হয় পলাতক জীবন। আমরা বিপদে পড়লে শুনেছিলাম মামি নাকি মামাকে আমাদের ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরে মামা বলেছিলেন, পেলে দু’জনকেই ফাঁসিতে ঝুলাব। মামি আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন।’

থামল সুস্মিতা বালাজী। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কাঁপছিল সুস্মিতা বালাজীর কণ্ঠ।

তার পাশেই বসেছিল ড্যাসিন দেবানন্দ। সে ধীরে ধীরে হাত রাখল সুস্মিতা বালাজীর কাঁধে। সান্ত্বনা দিতে চাইল সে।

কিন্তু ফল আরও বিপরীত হলো।

সান্ত্বনা তাকে বোধ হয় আরও দুর্বল করে দিল। তার দু’চোখ থেমে নেমে এল অশ্রুর বন্যা। দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

সেই সাথে উঠে দাঁড়াল। ‘স্যরি’ বলে বাড়ির দিকে ছুটল।

অপ্রস্তুত আহমদ মুসা। বেদনা তার চোখে মুখে। ড্যানিশ দেবানন্দ গম্ভীর।

দু’জনের কেউ কথা বলল না।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা।

এক সময় নীরবতা ভেঙে ড্যানিশ দেবানন্দ স্বগতউক্তির মত বলল, 'বিশ বছরের মধ্যে প্রথম কাঁদল সুস্মিতা। পিতার মৃত্যু সংবাদে একবার কেঁদেছিল। কিন্তু সে কান্নার ছিল ভিন্ন অর্থ।'

'আপার মা' বেঁচে আছেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ওঁর মা মারা গেছেন ছোট বেলায়।'

'ও! স্যরি! আত্মীয়-স্বজন কারও সাথে যোগাযোগ নেই?'

'সুস্মিতার এক ফুফাতো বোন থাকে পোর্ট ব্লেয়ারে। সেও ডাক্তার। সুস্মিতা এবং সে একসাথেই ডাক্তার হয়েছিল। তার সাথেই মাত্র যোগাযোগ আছে। সে এসছে এখানে।'

আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেকে গেল সুস্মিতা বালাজীকে ফিরে আসতে দেখে।

সুস্মিতা বালাজী এসেই বলল, 'স্যরি ছোট ভাই, আপনার কথার মধ্যেই অযথাই ছেদ নামল। কারা ওদের কিডন্যাপ করতে পারে, ভেবেছিন কিছু? আমার বুক কাঁপছে, এর চেয়ে খারাপ খবর আর হয় না।'

বলল সুস্মিতা বালাজী মাচায় ড্যানিশ দেবানন্দের পাশে বসতে বসতে।

মুখ চোখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসেছে সুস্মিতা বালাজী। মুখ চোখ থেকে বেদনার সেই কালেঅ মেধ একবারেই উধাও।

'কিডন্যাপ করেছে শংকরাচার্যের 'সেসশি'র লোকরাই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্যকথা। গভর্নরের অন্দর মহল থেকে শংকরাচার্যের লোকদের পক্ষে শাহ্ বানুদের কিডন্যাপ করা কি করে সম্ভব? আমি গভর্নর হাউজ দেখেছি, সেই অন্দর মহলে গেছি। এই কিডন্যাপ সম্ভব নয় শংকরাচার্যদের পক্ষে।' আহমদ মুসা বলল।

'আপনি তাহলে পুলিশের যোগ-সাজস সন্দেহ করছেন?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'শুধু পুলিশের যোগ-সাজসেই কি এতবড় কিপন্যাপ সম্ভব? গোয়েন্দাদের চোখ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সেটা গভর্নরের বাসগৃহ।'

‘তাহলে খোদ গভর্নরকেই আপনি সন্দেহ করছেন। তাই তো?’ সুষ্মিতা বালাজী বলল।

‘ঠিক সন্দেহ নয়, তাঁর সম্পর্কে ভাবছি। করণ তাঁর মুখ থেকেই সুষমা রাও শুনেছিল যে, ‘রস’ দ্বীপের গোডাউনে এক বন্দীকে রাখা হয়েছে। গভর্নর কাউকে টেলিফোনে একথা বলেছিলন। সুষমার কাছেও কথাটা অস্বাভাবিক লেগেছিল। তার কাছ থেকে একথা শুনেই আমি সন্দেহ নিরসনের জন্য ‘রস’ দ্বীপে যাচ্ছিলাম। রস দ্বীপেই শংকরাচার্যদের ‘সেসশি’র হেড অফিস’ একথা শোনার পর গভর্নরের কথা সত্য মনে হচ্ছে। সুতরাং তাঁর জড়িত থাকার কথা ভাবনায় আসতেই পারে।’

‘কিন্তু আপনি তো বলেছেন শাহ্ বানুদের পরিচয় গভর্নর জানেন না। তাহলে?’

‘সেটা ঠিক। কিন্তু তার সন্দেহ হতে পারে। তিনি খোঁজ নিতে পারেন। তাঁর তো এ সুযোগ আছে।’

সুষ্মিতা বালাজী কিছু বলতে গিয়েও থেকে গেল। মাঝবয়সী এক আদিবাসী তাদের দিকে আসছিল।

তাকে দেখেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘এস, দিওবা কি খবর?’

স্যার, গতকাল বলেছিলমা, দু........।’

কথা শেষ না করেই থেকে যেগে হলো দিওবাকে। তার কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘মাচাটায় আগে বস, কথা তোমার শুনছি।’ দিওবা মাচায় হেলান দিয়ে বলল, ‘বসেছি স্যার।’

হাসল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, ‘ঠিক আছে, বল তোমার কথা।’

‘স্যার গতকাল আপনাকে বলেছিলাম দু’জন ট্যুরিষ্ট পাহাড়ের উপরে আমাকে এসে বলেছিল, ‘আমরা আমাদের এক সাথীকে হারিয়ে ফেলেছি। সে আহত। তাকে কেউ কোথাও দেখেছ কিনা? পরে শুনলাম ঐ দু’জনই আমাদের আরেকজনকে বলেছে, আমাদের গাড়ি একসিডেন্ট করেছে। সিরিয়াস আহত আমাদের একজন। গাড়ি অচল হয়ে পড়েছে। এদিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা? আজ সকালে আমাদের আর একজন বলেছে, একদল ট্যুরিষ্ট এসেছে। ওরা

কয়েকদিন এ অঞ্চলে বেড়াবে। ওদের থাকার মত ব্যবস্থা কোথায় হতে পারে? তাদের আমাদের ভাল লাগেনি। তাই স্যার আপনাকে বলতে এলাম।'

'ধন্যবাদ দিওবা। ট্যুরিষ্টরা কোথায় উঠেছে, জান?' জিজ্ঞাসা ড্যানিশ দেবানন্দের।

'না স্যার, জানি না।'

'কোন দিন ট্যুরিস্ট তো এখানে আসেনি।' অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

ড্যানিশ দেবানন্দের স্বগতোক্তির বেশ বাতাসে মেলাবার আগেই দেখা গেল আরেকজন আদিবাসি এদিকে আসছে।

লোকটি কাছাকাছি আসতেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'অংগি, কি খবর? কারও অসুখ-বিসুখ করেনি তো?'

অংগি হলো স্কুলের কেরানী কাম গার্ড। স্কুলের সাথে লাগানো একটি বাড়িতে সে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে, মাঝ বয়সী লোকটি লেখা-পড়া জানতো না, কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান, খুবই বিশুস্ত। এখন অক্ষর জ্ঞান লাভ করার পর সে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় খাতা, রেজিষ্ট্রার লেখার কাজ চালাতে পারে।

'না, স্যার। এক সমস্যা হয়েছে।' বলল অংগি।

'কোথায়, কি সমস্যা?' প্রশ্ন ড্যানিশ দেবানন্দের।

'একদল ট্যুরিষ্ট এসে আমাদের স্কুল মাঠে তাঁবু গেড়েছে। কয়দিন থাকবে, বেড়াবে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

'কতজন ওরা?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'দশ বারো জন।'

'আদিবাসি কেউ নয়। সবাইকেই আমাদের ভারতীয় মনে হলো।'

'ঠিক আছে। ক্ষতি নেই। ট্যুরিষ্টরা তো কোনদিন আসে না এব অঞ্চলে। কয়েক দিন থেকে ওরা কি দেখবে?' নিস্পৃহ কণ্ঠ ড্যানিশ দেবানন্দের।

কথা শেষ করেই তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসাকে গম্ভীর দেখে বলল, 'এ সময় ওরা না এলেই ভাল হতো, কিন্তু এসে তো গেছে। আপিন কি ভাবছেন ছোট ভাই?'

'দিওবার খবরের সাথে অংগির খবর যোগ করলে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'আমারও মনে অস্বস্তি লাগছে এ খবর শোনার পর থেকেই।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

আহমদ মুসা অংগিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেছে ওরা?'

'জি স্যার।'

'কি জিজ্ঞাসা করেছে?'

'এখানে কোন দোকান, ডাক্তার খানা আছে কিনা? আর কোন ট্যুরিষ্ট আছে কিনা কিংবা ইংরেজি জানা শিক্ষিত লোক আছে কিনা, স্কুলে শিক্ষক কোত্থেকে আসে, এসব।'

'তুমি কি জবাব দিয়েছ?'

'আমরা আমাদের ভেতরের কোন ইনফরমেশন বাইরে দেই না। শুধু বলেছি, বাইরে কোন শিক্ষক নেই, বাইরে থেকে স্থাপিত কোন ডাক্তার খানা নেই, বাইরের কোন ডাক্তারও নেই। 'সাবাস! ধন্যবাদ তোমাকে। খুব বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়েছ।'

'আরেকটা খবর স্যার, ওদের সাথে দু'জন পুলিম এসেছে।' বলল অংগি ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে চোখ তুলে।

'দু'জন পুলিশ এসেছে?' কথাটা লুফে নিয়ে বলল আহমদ মুসা।

পুলিশের কথা শুনে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজীর চোখে-মুখে। গত বিশ বছর ধরে পুলিশকে এড়িয়ে চলা তাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'জি স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা কথা বলল না, একটা ভাবল। তারপর বলল, 'কি করে বুঝলে পুলিশ?'

'গায়ে ইউনিফর্ম আছে।'

'মাথায় পুলিশের টুপি আছে?'

'জি আছে।'

'পায়ে জুতা আছে?'

'আছে।'

'কি রং।'

'কালো।'

'টুপি খোলা অবস্থায় ওদের দেখেছ?'

'দেখেছি।'

'চুল তাদের কেমন?'

'বড়, ঘাড় পর্যন্ত নেমে যাওয়া।'

'ওদের হাতে কি, লাঠি?'

'না, স্যার। বন্দুক, মাসে ষ্টেনগান।'

'কি রং? সিলভার কালার, না অন্য রং?

'কালো।'

'আচ্ছা পুলিশরা কি করছে? পাহারায় বসে আছে।?'

'না স্যার। ওদের সকলের সাথে কাজ করছে।'

'কি কাজ করছে?'

'তাঁবু খাটানো থেকে ব্যাগ-ব্যাগেজ টানা সব কাজই করছে।'

'বড় বড় লাগেজ আছে ওরেদ সাথে?'

'খুব হালকা ব্যাগ।'

'তবে মনে হয় রা গায়ক দল। সবার হাতে একটা করে সেতার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে।'

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার।

তবে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বলল না।

একটু ভাবল। বলল, 'অংগি ওরা এখন কি করছে?'

'ওরা শুকনো খাবার নিয়ে এসেছিল। খেয়ে নিয়েছে। শুনলাম, ওঁরা দল বেঁধে বেরুবে।'

'এলাকায় কি দেখার আছে, পাহাড়ে যাবে?' বলল আহমদ মুসা।

'স্যার, ওরা বলল, এলাকা সম্পর্কে কার সাথে কথা বলা যায়? তোমাদের সর্দার কোথায়? তার সাথে কথা বলে সব জেনে নেবে। তারপর এলাকায় বেরুনো যাবে। আমরা বলেছি, আমরাদের কোন সর্দার নেই। আমাদের স্যার আছেন। তিনিই আমাদের সব। তারা বলেছে, তাহলে তাঁর সাথেই দেখা করব। দেখা করা যাবে তো, বাধা নেই তো? আমরা বলেছি, তাঁর দরকার সবার জন্য খোলা।'

'তার মানে ওরা এখানে আসছে?' বলল আহমদ মুসা।

'তাই ওরা বলেছে, স্যার।' বলল অংগি।

'বাইরের লোকদের কোন সময়ই এখানে আনিনি। তার উপর ওদের সাথে আছে পুলিশ।' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল। তার কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ।

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলল, 'সামনে দেখুন ভাই সাহেব।'

সাবই তাকাল সামনে।

তাকিয়েই অংগি বলে উঠল, 'স্যার ঐ তো ট্যুরিষ্টরা আসছে। আমাদের লোকরাও ওরদের সাথে আছে স্যার। পুলি দু'জনও আছে স্যার।'

'ছোট ভাই এখন কি করা?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল আহমদ মুসাকে।

ড্যানিশ দেবানন্দদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে আহমদ মুসা একটা চাপা কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল, 'ভয় নেই ভাই সাহেব, ওরা ভুয়া পুলিশ।'

'বলেন কি, জানলেন কি করে ছোট ভাই।' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। সুস্মিতা বালাজীরও চোখ নাচছে বিস্ময়ে।

'খবর বোধ হয় আরও আছে ভাই সাহেব। পরে দেখবেন হয়তো।' বলল আহমদ মুসা অনেকটা স্বগতকণ্ঠে।

পর্যটকদের দল অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছ। দু'জন পুলিশসহ ওরা বারোজন। ওদের দুপশ দিয়ে একটু দুরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে জনা দশেক আদিবাসি। পর্যটকদের সবার হাতে সেই বাদ্যযন্ত্র সেতার।

'ভাই সাহেব, সামনের তিন নম্বর মাচায় পর্যটকদের বসতে বলুন। ওরা একসাথে এক সারিতে বসতে পারবে। আর আপনার লোকরা.....।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে ড্যানিশ দেবানন্দ বলে উঠল, 'হ্যাঁ ওরা এক পাশ দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে ওরা বসতে চাইবে না।'

পর্যটকরা একদম কাছে এসে গেছে।

ওরা একসাথে হাঁটছে।

ওদের মধ্যমণি হিসাবে মাঝখানে দাঁড়ানো একজনের উপর আহমদ মুসার চোখ আটকে গেল। তাকে দেখেছে সে এর আগে। কোথায়? বিদ্যুৎ চমকের মতই মনে পড়ে গেল। সেদিন স্বামী স্বরূপানন্দের বন্দীখানা থেকে পালাবার সময় এসেও সে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। আহমদ মুসাও তার চোখে পড়ে গেছে। তার চোখ প্রথমে বিস্ময়-বিস্ফোরিত, তারপর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আহমদ মুসার চোখে কোন ভাবান্তর নেই। আহমদ মুসা তাকে চিনতে পেরেছে একথা প্রকাশ পেল না।

ওরা এগিয়ে এলে ড্যানিশ দেবানন্দ উঠে দাঁড়াল। অংগি দাঁড়িয়েই ছিল। সে ড্যানিশ দেবানন্দকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

সবাই বসল।

আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করল তার দেখা দেই লোকটি। দ্রুত চাপা স্বরে বলছে তার স্বাথীদের। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে তার সাথীদের মধ্যেও। এর মধ্যে একদম এপ্রান্তে বসা ওদের একজন বলে উঠল, 'আমরা বেড়াতে এসেছি। আপনারা আদিবাসী নন, এটা বুঝিনি। আমরা আপনাদের মত লোকই খুজছিলাম। আমরা খুব খুশি হলাম।'

তার কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'দেখছি আপনারা সকলেই সেতার প্রিয়। আর আমি বলতে পারেন সেতার বলতে অন্ধ।'

বলে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা এপ্রান্তের যে লোকটি কথা বলেছিল তার সামনে গিয়ে বলল, 'আপনার সেতারটা একটু দেখতে পারি। একটু বাজিয়ে দেখব।'

লোকটার চেহারায় বিব্রত ভাব প্রকাশ পেল। তার পাশের সাথীর দিকে একবার তাকাল। তারপর সেতারটি আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা সেতারটি হাতে নিয়ে বুঝল তার অনুমান ঠিক। খুশি হলো আহমদমুসা।

সেতারটি নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে দু'ধাপ পেছনে সরে এল। বলল, 'চমৎকার সেতার।'

সেতার বাজাতে শুরু করল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সত্যি সেতার ভাল বাজায়।

প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী।

আহমদ মুসা তখন ভাবছিল অন্য কথা। এদের পরিকল্পনা কি। এ সময় কিংবা দিনের বেলা সবার সামনে কিছু না করে রাতের সুযোগ তারা নেবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আহমদ মুসাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর সুযোগটা ছেড়ে দিয়ে তারা রাত পর্যন্ত অপেক্ষার ঝুঁকি নেবে, এটাও অস্বাভাবিক। আহমদ মুসা ওদের মধ্যেই উত্তেজনা লক্ষ্য করল।

আহমদ মুসা সেতার বাজানো থামিয়ে মুখ ফিরাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, 'স্যরি, সুর দিয়ে একটা সেকুরো কাজ করে ফেললাম। মেহমানদের সাথে কথা বলু.....।'

পেছনে একটা কর্কশকণ্ঠ আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিল। কর্কশ কণ্ঠটির নির্দেশ, 'বার্গম্যান, দেবানন্দ বাবু সবাই হাত তুলে দাঁড়ান।'

আহমদ মুসার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেখল, বিষ্মিত ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী হাত তুলে দাঁড়াচ্ছে। আহমদ মুসাও সেতার দু'হাতে ধরে রেখেই হাত দু'টি উপরে তুলতে তুলতে ঘুরে দাঁড়াল। আহমদ মুসা দেখল, বন্দীখানায় দেখা সেই লোকটিই ষ্টেনগান তাক করেছে তাদের দিকে। তার ষ্টেনগানটি সেতারের খোলস থেকে বের করে নিয়েছে। অন্যেরা ষ্টেনগান বের

করেনি কিংবা তাক করে উপরে তোলেনি, কিন্তু সবাই সেতারকে পজিশনে নিয়েছে এবং সবারই হাত ষ্টেনগানের ট্রিগারে, বুঝল আহমদ মুসা।

ওদিকে পাশে দাঁড়ানো আদিবাসীদের মধ্যে ভয় ও গুঞ্জন দুই'ই সৃষ্টি হয়েছে।

সেই লোকটির কর্কশ কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো, 'নরেন, বিরেন তোমরা আদিবাসীদের গুঞ্জন থামিয়ে দাও।'

কথা বলার সময় তার চোখ ও ষ্টেনগানের নল আহমদ মুসার দিক থেকে একটুকুও সরায়নি।

'তাহলে ঐ পরিচিত লোকটি এখন ওদের নেতাও।' ভাবল আহমদ মুসা।

লোকটির নির্দেশ নরেন-বিরেনরা পাওয়ার সাথে সাথেই ওদের সারি থেকে দু'জন লোক তাদের সেতার ঘুরিয়ে নিল এবং আদিবসীদের দিকে লক্ষ্য করে একপশলা ফায়ার করল। তিনজন আদিবাসী গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল।

গুলী করেই নরেন অথবা বিরেন লোকটি চিৎকার করে বলল, 'আমরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত সবাই হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। না হলে সবাইকে লাশ করে দেব।'

এদিকে আহমদ মুসারেদ টার্গেট করা লোকটি আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে দেখামাত্রই হত্যা করতমা। কিন্তু তোমাকে আমাদের জীবন্ত প্রয়োজন। আহমদ শাহ্ আলমগীরের মা-বোনকে ধরেছি। আহমদ শাহ্ আলমগীরের মুখ খোলার জন্যে সবাইকে দরকার। কিন্তু মনে রেখ, কোন চালাকির আশ্রয় নিলে কুকুরের মতো গুলী করে মারব।'

বলেই সে যার হাত থেকে আহমদ মুসা সেতার নিয়েছিল তাকে নির্দেশ দিল, 'যাও শয়তানটার কাছ থেকে সেতারটা নিয়ে নাও।'

লোকটি নির্দেশ পেয়েই উঠে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়াল। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও সেতার।'

আহমদ মুসা হাত তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'হাতে ধরে রেখেছিল সেতারটি। এমনভাবে ধরেছিল যাতে ডানহাতের তর্জনি সেতাররে ট্রিগার হোলে ঢুকিয়ে রাখা যায়।

আহমদ মুসা সেতারটি বুক বরাবর নামিয়েই সেতারটি লোকটির হাতে তুলে দেবার ভঙ্গিতে বাম পাটা একধাপ এগিয়ে নিল, তারপর ডান পা বিদ্যুৎ গতিতে ছুড়ল লোকটির দিকে। আঘাত করল লোকটির তলপেটের নিচে। লোকটি দেহ মুহূর্তে ধনুকের মত বেঁকে গেল।

ততক্ষণে আহমদ মুসার সেতার গুলীবর্ষণ শুরু করেছে। প্রথম গুলীটি বিদ্ধ করল আহমদ মুসার পায়ের আঘাতে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটিকে।

তারপর আহমদ মুসার হাতের সেতারটি মাচানে সবা ওদের দিকে তাক করে ট্রিগার চেপে ধরেছিল।

সেতার থেকে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃষ্টি ওদের উপর দিয়ে দু'বার ঘুরে এল।

ওদের বাকী ১১জনই দু'টি মাচানে সারিবদ্ধ হয়ে বসেছিল।

গুলী বৃষ্টি দু'বার ঘুরে আসার পর ওরা সবাই লাশ হয়ে পড়ে গেল, কোউ মাচার উপর, কেউ মাচার নিচে।

গুলী শেষ করেই আহমদ মুসা সেতারটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে ছুটল আদিবাসীদের দিকে। দ্রুত গেল তিনজন আহতের কাছে। দেখল, তিনজনেরই দেহে একাধিক গুলরি আঘাত। তবে দেহের উপরের দিকটা নিরাপদ।

আহমদ মুসাকে আদিবাসীদের দিকে ছুটতে দেখে ড্যানিশ দেবানন্দ সুষ্মিতা বালাজীকে টেনে নিয়ে সেদিকে ছুটে এসেছিল।

ওরাও এসে আহতদের পাশে বসল।

'আপা, ওরা সবে থেকে সুনির্দিষ্ট টার্গেট ছাড়াই গুলী করেছে, অন্যদিকে এদের দাঁড়ানোর জায়গা তো উঁচু। তাই দেহের উপরের অংশটা বেঁচে গেছে।' বলল আহমদ মসা সুষ্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তোমরা এদেরকে মাচায় তোল, আমি মেডিকেল কীট নিয়ে আসি।' বলে ছুটল সুষ্মিতা বালাজী ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ দু'জন আহতকে তুলতে যাচ্ছিল।

ছুটে এল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়া আদিবাসীরা। সমস্বরে বলে উঠল, 'স্যার আপনারা সরুন, আমরা তুলছি।'

সরে এল আমহদ মুসারা।

আহমদ মুসা বলল, 'ঠিক আছে ওরা ওদের তুলি নিক, ততক্ষণে আমি দেখি ওদের কেউ জীবতি আছে কিনা।'

বলে আহমদ মুসা ওদিকের মাচার দিকে চলল।

তিনজন আহতকেই মাচার উপর তোলা হয়েছে।

সুষ্মিতা বালাজী তার মেডিক্যল কীট নিয়ে এসে গেছে।

এদিকে মানুষের ঢল নেমেছে।

গুলীর শব্দ শুনে ছুটে আসছে আদিবাসীরা।

'ছোট ভাই, আপনি এদিকে আসুন। আপনার সাহায্য দরকার। কি করছেন আপনি ওখানে?' বলল সুষ্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'দেখছিলাম, এদের কেউ বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু কেউ বেঁচে নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'বেঁচে থাকলে কি করতেন?' ঠোঁটে হাসি টেনে প্রশ্ন করল সুষ্মিতা বালাজী।

'অসুস্থ, আহত ও আত্নসমর্পণকারীরা আর শত্রু থাকে না। তাছাড়া তাদের কেউ আহত থাকলে, তাকে বাঁচানোর মধ্যে লাভ ছিল। কিছু তথ্য আদায় করা যেত। তাদের সম্পর্কে তথ্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।' আহমদ মুসা বলল।

কথা শেষ করে সুষ্মতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের সাথে আহতদের সেবার কাজে যোগ দিয়ে বলল, 'তবু কিছু জানার একটা সুযোগ আছে। এদের মোবাইলগুলো যোগাড় করেছি, আর স্কুল মাঠে আছে এদের ব্যাগ-ব্যাগেজ। ওসব থেকে কিছু তো পাওয়া যাবেই।'

'ঈশ্বর সহায় হোন।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

তিনজনই কাজে লেগে গেল। চারদিকে মানুষের দেয়াল।

ঘটনার খবর আগুনের মত ছড়িয় পড়েছে। সবাই এসে হাজির হয়েছে তাদের স্যারের বাড়িতে। তোদের চোখে-মুখে বিষ্মিয় বেদনা ও পর্বত প্রমাণ উৎসুক্য। কিন্তু তাদরে স্যাররা ব্যস্ত।

তাদের উৎসুক্য মেটাচ্ছে, তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে অংগি, দিওবা এবং অন্য যারা আঘে থেকেই উপস্থিত ছিল এখানে। আদিবাসীরা একে একে জেনে ফেলল তাদের মেহমানের বিষ্ময়কর বাহাদুরীতে বেঁচে গেছে তাদরে স্যাররা, বেচে গেছে আদিবাসীরা। ওরা পর্যটকের ছদ্ধবেশে, ষ্টেনগানগুলোকে সেতারের খোলসে ঢেকে এনেছিল ডাকাতি করতে, লুটতরাজ করতে। বাঁচিয়েছে তাদের মেহমানের বাহাদুরী।

আদিবাসীদের শত শত চোখের কৃতজ্ঞ ও প্রশংসার দৃষ্টি আহমদ মুসার প্রতি নিবদ্ধ। মুহূর্তেই আহমদ মুসা তাদের 'হিরো'তে পরিণত হয়ে গেল।

এদিকে আহতদের আহত স্থান ওষধ  দিয়ে পরিস্কার করা, প্রয়োজনে অপারেশন করে গুলী বের করা, আহত জায়গা সেলাই করা, ব্যান্ডেজ করা এবং সেই যন্ত্রণাকাতর লোকদের সান্তনা দেয়ার কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ কাজ এগিয়ে চলেছে।

'ছোট ভাই, এ স্পেশালাইজড কাজেও দেখছি আপনি দক্ষ।' কাজ করতে করতেই এক সয় বলে উঠল সুষ্মিতা বালাজী আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কাজ থেকে চোখ না সরিয়েই আহমদ মুসা উত্তরে বলল, 'আমার ক্ষেত্রে এমত ঘটনা এত বেশি ঘটেছে যে, দেখতে দেখতে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।'

'ছোট ভাই, এতদিন আপনার কথা পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু আজ চোখে দেখলাম, আপনি কি! আপনি কি করে জানলে যে সেতারের খোলসে ষ্টেনগান আছে, কি করেই বা বুঝলেন সে ষ্টেনগানটির ট্রিগার কোথায়, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে! পাল্টা আঘাত করার সময়টাই বা কিভাবে বেছে নিলেন! চোখের পলকেই এমন ঘটনা ঘটলোই বা কিভাবে!' একটা আহত স্থান সেলাইরত অবস্থায় বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'সবই আল্লাহর সাহায্য, আপা।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি বুঝতে পারছি না ছোট ভাই, আপনি সেতারটা ওদের একজনের হাত থিকে নিয়েছিলেন সত্যি বাজনোর জন্যে, না আপনি অস্ত্র জেনেই ওটা হাত করেছিলেন?' একজনের সেলাইকরা আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল যে, সেতারের খোলসে ওগুলো আসলে অস্ত্র। অস্ত্র হিসেবেই সেতারটা আমি হাত করেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'আপনার এ নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবার কারণ?' প্রশ্ন করল সুষ্মিতা বালাজী। হাতের কাজটার উপর চোখ রেখেই।

'সে অনেক কথা। দেওবার কাজ থেকে খবরগুলেঅ জানার পর পর্যটকদের আগমনকেই আমি সন্দেহ করেছিলাম। দু'জন পুলিশের আকার-আকৃতি ও আচার-আচরণের কথা শুনে আমি বুঝেছিলাম। ওরা আসলে পুলিশ নয়। পুলিশ সাজিয়ে আনা হয়েছে মানুষকে ভয় দেখাবার জন্যে এবং বাড়তি সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে। তারপর ওরা এলে ওদের একজনকে আমি চিনতে পারি। স্বামী স্বরূপানন্দের বন্দীখানা থেকে বেরুবার সময় ওকে আমি দেখেছিলাম। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল এবং তার সাথী সবাইকে ইংগিতে জানিয়ে দিয়েছিল। ঐ লোকটিই আমাদের প্রতি ষ্টেনগান তাক করেছিল। আহমদ মুসা বলল।

'যদি সেতারটি আপনি না নিতে পারতেন কিংবা আপনি যদি গুলী করার সুযোগ না পেতেন, তাহলে কি ঘটত তা ভাবতেও ভয় লাগছে। বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'আপনা, কখনও কোন সংকটই নিশ্ছিদ্র হয় না। প্রত্যেক সংকটের সাথে সংকট উত্তরণের সুযোগও থাকে। প্রয়েজন হলো সে সুযোগ বের করে নেয়া এবং সদ্ব্যবহার করা।'

'কিন্তু সুযোগ সব সময় বের করা নাও যেতে পারে, বা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্ভব নাও হবে পারে।' বলল সুষ্মিতা বালাজী।

'হ্যাঁ আপা। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সেটাও হতে পারে।' আহমদ মুসা বলল।

'জীবন-মৃত্যুকে এমন পাশাপাশি দেখেও আপনার ্কটুকুও ভায় করে না?' সুষ্মিতা বালাজী বলল।

'আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে, 'আমার জীবন, মরণ, সাধনা, কুরবানী সব বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহর জন্যে।' এটা যদি বিশ্বাস হয় তাহলে ভয় কোত্থেকে আসবে?' বলল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু আপনার স্ত্রী আছে যাকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন, আপনার সোনার টুকরো সন্তান আছে, যে আপনার কাছে আপনার চেয়ে প্রিয়। জীবন-মৃত্যুর এই ধরনের চরম সন্ধিক্ষণে তাদের স্মরণ আপনাকে দুর্বল করে না?’ শেষ বান্ডেজটি সম্পন্ন হওয়ার পর আহমদ মুসার দিকে মুখ তুলে বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘আপা, আমাদের কুরআন শরীফের আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, নিজের পিতা, নিজের সন্তান, নিজের ভাই, নিজের পত্নী, নিজের জাতি-গোষ্ঠী, নিজের অর্জিত সম্পদ, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিজের বাড়ি-বাসস্থান থেকে আল্লাহকে, তার রসূলকে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামকে বেশি ভালবাসতে হবে।’ এটা যেহেতু আমার ঈমান, তাই সন্তান ও স্ত্রীকে আমি বড় করে দেখব কি করে?’

সঙ্গে সঙ্গেই সুস্মিতা বালাজী বলে উঠল, ‘কিন্তু আপনার এই সংগ্রাম তো আল্লার জন্যে, তার রসূল স.-এর জন্য নয় কিংবা তার পথের জন্যে সংগ্রাম নয়।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমি যা করছি তা আল্লার পথের সংগ্রাম হিসেবেই করছি। মজলুম, অত্যাচারিতদের সাহায্যে এগিয়ে যাবার জন্যে আল্লাহ শুধু নির্দেশই দেননি বরং যারা আর্ত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে যায় না, তারা কেন যায় না এ নিয়ে আল্লাহ তাদরে অভিযুক্তও করেছেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের কি হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহর জন্যে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্যে যারা-ফরিয়াদ করছে, হে আল্লাহ এই যালেমের জনপদ হতে আমাদে অন্যত্র নিয়ে যাও..........।’ আল্লাহর এই আদেশ অনুসারে প্রত্যেক অত্যাচারিত, মজলুম মানুষের জন্য সংগ্রাম করা আল্লাহর পথে কাজ করা একই কথা। আমি তো এই কাজের জন্যে আন্দামানে এসেছি এবং এই কাজ করছি।’

সুস্মিতা বালাজীর চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে রক্তভেজা তুলা, ব্যান্ডেজের বর্জ সবকিছু একসাথে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে তুলতে তুলতে বলল, ‘বিস্মিত হচ্ছি ছোট ভাই, আপনাদের ধর্মে দেখছি সব বিষয়ে কথা আছে, নির্দেশ আছে, নিয়ম আছে। আপনার শেষ উদ্ধৃতি যদি কুরআনের কথা হয়,

তাহলে তো বলতে হবে, কুরআন মুসলমানদের জন্যে নয়, কুরআন মানুষের জন্যে। আর আপনার ধর্ম শুধু নয়, জীবন-ধর্ম, জীবন্ত ধর্ম।'

সুস্মিতা বালাজীর কথা শেষ হতেই ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, 'থাম থাম সুসি, এই কিছুক্ষণ আগে তুমি বললে আমি নাকি ছোট ভায়ের ধর্মকে ওয়াকওবার দিয়েছি। কিন্তু এখন তো তুমি ডাবল ওয়াকওভার দিলে।

সুস্মিতা বালাজী দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা আগেই বলে উঠল, এ প্রসঙ্গ এখন থাক আপনা। ওদিকে আমাদের মনোযোগ দেয়া দরকার। গ্রামবাসীদের কিছু বলুন। আহতদের কোথায় পাঠাবেন বা রাখবেন সে ব্যবস্থা করুন।

'ধন্যবাদ ছোট ভাই।' বলে সুস্মিতা বালাজী তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দের দিকে। বলল, 'দিওবা, অংগি গ্রামবাসীদের কিছু বলেছে। তুমিও ওদের কিছু বল। লাশগুলো কি করবে, ওদের লাগেছর কি হবে, সব ব্যাপারে ওদের নির্দেশ দিতে হবে।' বলল সুস্মিতা বালাজী।

ড্যানিশ দেবান্দ তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'লাশগুলো ও লাগেজের কি হবে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?'

'লাশগুলো বয়ে নিয়ে পাহাড়ের ওপারে রাস্তার পাশে রাখা ওদের গাড়িতে তুলে রাস্তার পাশেই গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। আর এদের পকেটের টাকা-পয়সা, লাগরজর জিনিসপত্র সবকিছু গ্রামবাসীদের কল্যাণ-ফান্ডে জমা দি। অস্ত্রগুলো আপনার অস্ত্রগারে রাখুন। আর গ্রামবাসীদের বলুন ১২জন পর্যটকের এই উপত্যকায় আসাসহ যা কিছু ঘটেছে যেন তারা ভুলে যায়। কেউ অনুসন্ধানে এলে তারা কিছুই জানে না বলবে।'

'চমৎকার ছোট ভাই। এমন সমাধান দিয়েছেন যার কোন বিকল্প নেই। ধন্যবাদ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

সুস্মিতা বালাজীরও চোখ দু'টি বিমুগ্ধতায় উজ্জ্বল। বলল, 'আমারও ধন্যবাদ নিন ছোট ভাই। কিন্তু একটা কথা, সবশেষে আপনি যে গ্রামবাসীদের মিথ্যা কথা বলার পরামর্শ দিলেন?'

'না, ওটা মিথ্যা বলা নয় আপা। যুদ্ধের একটা কৌশল ওটা। যুদ্ধক্ষেত্রে শুত্রুকে বিভ্রান্ত করা যুদ্ধেরই একটা অস্ত্র। সে অস্ত্রই আমরা প্রয়োগ করেছ।'

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। ড্যানিশ দেবানন্দও হাসল।

বলল সুষ্মিতা, 'বুঝেছি ছোট ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে। কথাটা আমরাও অন্যভাবে জানতাম। কিন্তু আপনি একে যে 'তাত্বিক রূপ' দিয়ে প্রকাশ করলেন তা অবিস্মরণীয়। আপনাদের আবারো ধন্যবাদ।'

'আমার পক্ষ থেকেও ধন্যবাদ।' বলে উঠে দাঁড়াল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'দেখি আমাদের লোকদের সাথে কথা বলি।' বলে ড্যানিশ দেবানন্দ গ্রামবাসীদর দিকে এগুলো।

আর আহমদ মুসা ও সুষ্মিতা বালাজী পানি ভর্তি বালতির দিকে এগুলো। জারওয়া ইতিমধ্যেই বালতিতে করে পানি, সাবান, তোয়ালে এনেছিল।

রাত কথন ১০টা।

আষাঢ়ে মেঘের মত মুখ ড্যানিশ ও সুষ্মিতা বালাজী দু'জনেরই। তারা বসে আছে এক সোফায় পাশাপাশি।

তাদের সামনে আর এক সোফায় বসে আছে আহমদ মুসা। গম্ভীর তার মুখ।

'আজ রাতে এখনই চলে যাবেন, এটা সত্যি ফাইনাল?' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ। তার গলায় ক্ষোভের সুর।

'হ্যাঁ, যেতে হবে ভাই সাহেব।' বলল আহমদ মুসা।

'হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত কেন?' সুষ্মিতা বালাজী বলল। তার কণ্ঠ ভারী।

'সে কথা বলঅর জন্যেই তো ডেকেছি আপা আপনাদের।' বিকেল থেকে এ পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তাতেই এ সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে হয়েছে।'

'আজ এতবড় ঘটনা এখানে ঘটল। রাতেই আপনি চলে গেলে কেমন হবে। আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। এ গ্রামেও নয়। কোন কিছুতেই ভয়

আমার নেই। এই অঞ্চলকে অপরাধ মুক্ত করতে সব রকম ক্রিমিনালদের সাথে লড়তে হয়েছে আমাদের। কিন্তু আজ যা ঘটল তা নতুন। আর এর সাথে আমার পুরানো শ্রক্রর যোগ রয়েছে। তাই বলছিলাম, 'দু'একদিন থাকলে ভাল হতো।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আমি এ দিকটা চিন্তা করেছি ভাই সাহেব। নিহত বারজনের কাছ থেকে যে মোবাইলগুলো পেয়েছি, সেসব চেক করতে গিয়ে শংকরাচার্যের মোবাইল নাম্বার পেয়ে যাই। আমি তাকে বলেছি, তার পাঠানো বারজন খুনিকেই আমি শেষ করেছি। আমি আসছি পোর্ট ব্লেয়ারে।'

'সে কি পোর্ট ব্লেয়ারে আছে?' ড্যানিশ দেবানন্দ বলল।

'সেও বলেনি। আমিও জানি না। জিজ্ঞাসাও করিনি। আমি চেয়েছি তার দৃষ্টি এই উপত্যকা থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে সরিয়ে দিতে।'

'ধন্যবাদ ছোট ভাই। আপনি সত্যিই গ্রেট। আপনি কত বড় আপনিই জানেন না। আপনি উপত্যকার অসহায় লোকদের বাঁচিয়েছেন। আমার বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল। জানি এই আদিবাসী লোকরা ভাই-বোনের চেয়েও আমার কাছে বড়। শংকরাচার্যের মত যে শয়তান আমার পরিবার ধ্বংস করেছে, আমাদের বনবাসী করেছে, সেই শয়তান শকুন দৃষ্টি আমার উপত্যকায় সরল সহজ, দরিদ্রলোকদের উপর না পড়ুক, এটা চাচ্ছিলাম। মনে হয় আমার ভাবার আগেই আপনি আমার চাওয়া পুরণ করেছেন। কেউ সব মানুষকে ভাল না বাসলে এমনভাবে আগাম ভাবতে পারে না। ছোট ভাই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি মানুষকে ভালবাসেন।'

আহমদ মুসা মুখ খুলেছিল কিছু বলর জন্যে। কিন্তু তার আগেই সুস্মিতা বালাজী বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য  করে, 'এত করার মধ্যেও' কিন্তু বুঝা গেল না কেন আপনাকে এই রাতে যেতে হবে।'

'বলছি সে কথা। আমি শংকরাচার্যকে টেলিফেন করেছিলাম তাকে জানাবার জন্যে যে, সে যে বারজনকে পাঠিয়েছিল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে, তারা সবাই খতম হয়ে গেছে। আমি আসছি পোর্ট ব্লেয়ারে। সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে বলেছে, শাহ্ বানু ও সাহারা বানু এখন তার হাতের মুঠোয়। আমি যদি

আগামীকাল সকাল ৮টার মধ্যে তাদের হাতে নিজেকে সোপর্দ না করি, তাহলে শাহ্ বানু সাহারা বানু আগামীকালই ধর্ষিতা হবে এবং লাঞ্ছিত জীবন যাপনে তাদের বাধ্য করা হবে। আমি জানি সে যা বলছে, তা করবে। এই অবস্থায় তাদের হাতে নিজেকে সোপর্দ করা ছাড়া আমার উপায় নেই। তাই সকালের মধ্যেই আমাকে পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছতে হবে।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই আর্তনাথ করে উঠেছে ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুষ্মিতা বালাজী দু'জনেই। বিস্ময়-বেদনায় ছানাবড়া হয়ে গেছে দু'জনের চোখ।

আহমদ মুসা থামলে কথা বলতে চেষ্টা করল সুষ্মিতা বালাজী। কিন্তু পারল না। প্রবল এক উচ্ছ্বাস তার জিহবা ও কণ্ঠকে যেন আড়ষ্ট করে দিল।

কথা বলে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ। বলল, 'ছোট ভাই আপনি একথাগুলো স্বপ্নে বলছেন না বাস্তবে বলছেন? আপনাকে ওরা হাত পেলে কি করবে জানেন?'

'আমি সে কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, আমার নিজেকে বাঁচাবার যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটুকু ক্ষমতা শাহ্ বানু সাহারা বানুর নেই। আর আমি ওদের হাতে হয়তো কষ্ট পাব, কিন্তু তাতে আমার অসম্মান হবে না, আমার জীবনও নষ্ট হবে না, কিন্তু শাহ্ বানুরা হারাবে সবকিছু। আমার সজ্ঞানে আমাদের মা-বোনকে এইভাবে ওদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। বলল আহমদ মুসা।

'আপনার কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এরপরেও বলল আপনার জীবন কি ওঁদের নিরাপত্তার বিনিময় হতে পারে? আপনাকে এভাব অবমূল্যায়ণ করার অধিকারি কি আপনার আছে।' আবেগকম্পিত কণ্ঠে সুষ্মিতা বালাজী।

'আপা, এমনি বা আমার অজ্ঞাতে তাদের একটা কিছু যদি হয়ে যেত, তাহলে সান্তনার একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা এ বিষয়ে ঘোষনা দেয়ার পর এবং আমি তা জানার পর, তাদের সম্মান শুধু জাতির সম্মান নয় গোটা মানব জাতির সম্মানের মত বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে তাদের রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় আমার সাথে যুক্ত হবার পর, আমার দায়িত্ব সবচেয়ে বেড়ে গেছে। এ

দায়িত্বের আহবানে আমাকে সাড়া দিতেই হবে।’ বলল আহমদ মুসা। আগেব উত্তেজনাহীন শান্ত কণ্ঠ আহমদ মুসার।

হাতাশা ও অসহায়তার অন্ধকার নেমেছে সুষ্মিতা বালাজী ও ড্যানিশ দেবানন্দের চোখে-মুখে।

মুষড়ে পড়েছে সুষ্মিতা বালাজীই বেশি। তার শুকনো ঠোঁট দু’টি উত্তেজনায় কাঁপছে। সে কম্পি কণ্ঠে বলল, ‘কিন্তু ওদরে হাতে ধরা দিলেই যে ওঁরা ছাড়া পাবেন বা রক্ষা পাবেন, এর কোন গ্যারান্টি আছে? আমার বিশ্বাস ওরদর সাথে আপনাকেও হাতে পাবার ওদের একটা ফাঁদ এটা। যদি তাই হয়, তাহলে সবাই শেষ হবে। অতএব অনিশ্চয়তা মাঝ এ ঝঁকি নিতে পারেন না।’ কান্না রুদ্ধ কণ্ঠে বলল সুষ্মিতা বালাজী।

‘আপনার কথায় যুক্তি আছে। হয়তো এটাই ঘটবে। কিন্তু এই যুক্তির আড়াল নিয়ে আমি বসে থাকতে পারি না। বিপদগ্রস্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দায়িত্ব, চেষ্টার ফল হিসাব করে নয়। আপনি যেটা বলেছেন, হতে পারে এটা তাদের ফাঁদ। কিন্তু ফাঁদ পেতে তারা জয়ী হবে একথাও তো নিশ্চিত করে বলা যাবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এছাড়া সামনে এগুবার আর কোন রাস্তা নেই?’ বলল ড্যানিশ

‘ভেবে দেখেছি। আর কোন পথ নেই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এখন দেখছি এই উপত্যকার নিরপত্তার কথা ভেবে টেলিফোন করতে গিয়ে এই বিপিদে পড়েছেন। আপনাকে না পেলে এই আলটিমেটাম দিতে পারতো না। শাহ বানুদের উপরও তাহলে এই বিপদ চাপতো না।’ শুকনো কণ্ঠে বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাই সাহেব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আপনি আরও দৃঢ় করুন। যা ঘটবে তাই কিন্তু ঘটে যায়, কার্যকারণের দিক থেকে ভাল-মন্দ যাই হোক। আমার টেলিফোন করা, এই সংকট সৃষ্টি হওয়া সবই অদৃশ্য এক পরিকল্পনার অংশও হতে পারে। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করে করণীয় কাজ করে যাওয়াই মানুষের কাজ।’

'আপনার সব কথাই সত্য ছোট ভাই। কিন্তু বিষয়টাকে আপনি যত হালকা করে দেখছেনম, ততো সহজ নয় ব্যাপারটা। একজন বা দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি মৃত্যুদণ্ড নিজে গ্রহণ করছেন। কোন বোন তার ভাইকে এ অনুমতি দিতে পারে না। কিন্তু আমি সত্যিই তো বোন নই।' আবেগ-কম্পিত গলায় বলল সুস্মিতা বালাজী।

'ছোট ভাই, উত্তর দিন এবার।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'যার বড় বোন কোন দিন ছিলই না, সে কাউকে বড় বোন হিসাবে পেলে তার সাথে 'বড় বোন'-এর মতই ব্যবহার করবে । কারও আপন বোন থাকলেই শুধু সে 'পাতানো বোন'-কে 'পাতানো' বলে বুঝতে পারে। আমার সে সুযোগ নেই।'

বলে একটু থামর আহমদ মুসা। তারপর মুখ তুলে তাকাল ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর দিকে। ঠোকে হাসি আহমদ মুসার। বলল, 'ভাই সাহেব, আপপ, আমি কার দণ্ড নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছি না। অন্যের প্রতি আমার দায়িত্বের কথা যখন ভাবি, নিজের প্রতি দায়িত্বের কথাও আমি মনে রাখি। আজ আমি যখন শাহ্ বানুদের সাহায্য করতে যাচ্ছি, তখন আমার নিজের প্রতি দায়িত্বের কথাও আমি অবশ্যেই ভাবছি। কিন্তু আমি আমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবো, সেটা আল্লাহই ভাল জানেন।'

'ধন্যবাদ ছোট ভাই, আপনার কথা বুঝেছি। কিন্তু শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া কি আপনার নিজের প্রতি অবিচার নয়? এর পর দায়িত্ব পালন করবেন কিভাবে?' বলল সুস্মিতা বালাজী।

'আমি জানি না কিভাবে, কিন্তু করব এটা আমি জানি। কঠিন বিপদের মধ্যে পদে পদে আমি আল্লাহত সাহায্য পেয়েছি, একনও আমি তাঁরই সাহায্য প্রার্থী।'

সুস্মিতা বালাজী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'জানি আপনি আহমদ মুসা। মজলুম মানুষের জন্যেই আপনি আজ যাযাবর। ঈশ্বরের অফুরন্ত ভালোবাসা আপনার সাথে আছে। আমরা যা বলেছি সেটা আমাদের চাওয়া। কিন্তু আমাদের চাওয়া আহমদ মুসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে খুশি হয়েছি যে, নিজের

প্রতি দায়িত্বের কথা আপনি ভুলে থাকেন না। আমাদের উদ্বেগের জবাব এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।' থামল সুষ্মিতা বালাজী। শুকনো কণ্ঠ তার।

'যাবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলে ছোট ভাই। আপনি এমন এক পাখি, যে গাছ তেকে একবার ওড়েন, সে গাছে আর ফিরো আসার সুযোগ হয় না, এটাই দুঃখ। এখন মনে হচ্ছে এই কয়টা দিন জীবনে না এলেই ভাল হতো। বিদ্যুৎ চমকের পর যে অন্ধকার নামে, সেটা আরও কষ্টকর।' ড্যানিশ দেবানন্দ তার কথা হাসি দিয়ে শুরু করলেও তার কণ্ঠ শেষে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'মনে রাখবেন ভাই সাহেব, আপনাদের আলোর জীবনে না নিয়ে এসে আমি আন্দামান থেকে উড়ব না।'

'এই উপত্যকাকে অন্ধকার করে নয় কিন্তু।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'এনই উপত্যকা আজ নিজের আলোতেই আলোকিত। গোটা আন্দামান যদি এই উপত্যকা হতো তাহলে কতই না ভাল হতো!' আহমদ মুসা বলল।

'আপনাকে ধন্যবাদ ছোট ভাই উপত্যকাবাসীর পক্ষ থেকে। একটা কথা ছোট ভাই, এভাবে চলে গিয়ে কিন্তু দু'জন নতুন মুসলিম সদস্য হারালেন।' বলে হেসে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'হারালাম কোথায়? তাঁরা তো মুসলিম সদস্য হয়ে গেছেন। এই উপত্যকায় তাদের রেখে গেলাম নতুন বিশ্বাসের আলো জ্বালাবার জন্যে।'

'কিন্তু তারা দু'জন তো এ ঘোষণা দেয়নি।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'এটা ঘোষণার ব্যাপার নয়, বিশ্বাস ও মননের পরিবর্তনের বিষয় এটা। এই পরিবর্তন সংঘটিত হলে ঘোষণার ব্যাপার স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ঘটে যায়। আমি জানি এ পরিবর্তন দু'জনের মধ্যে এসেছে। এরখন আপনাদের সাক্ষী মানছি, বলুন পরিবর্তন এসেছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

'সুসি, অস্ত্র তো বুমেরাং হলো। এখন সাক্ষী দাও। কি বলবে, বল।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসল সুষ্মিতা বালাজী। বলল, 'ভাই সাক্ষী দেবার পর বোনের সাক্ষী দেবার প্রয়োজন আছে? এখন আপনিই বলুন ছোট ভাইয়ের সাক্ষী আপনি গ্রহণ করছেন কিনা।'

'তোমরা ভাই-বোন দেখছি আমাকে ট্রাপে ফেলার চেষ্টা করছ।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আমরা ট্রাপে ফেললাম কোথায়।'

'আপনি না আগেই কনফেস করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' ড্যানিনশ দেবানন্দ বলল।

'আপনি দু'জন নতুন মুসলিম সদস্য' হারাবার কথা বলেছেন। তার অর্থ এই যে, আপনারা দু'জন মুসিলিম সদস্য হয়ে গেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

হেসে উঠল ড্যানিশ দেবানন্দ।

হাসি থামিয়ে মুহূর্তেই সে আবার গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'বিশ্বাসের পরিবর্তন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়-সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারও। কিন্তু এ তত্বকতা কোনই কাজে লাগল না। আপনি এলেন এবং জয় করে নিলেন। আপনাকে ধন্যবাদ ছোট ভাই।'

'না ধন্যবাদ, মোবারকবাদ আপনাদের জন্যেই। সত্যকে এত দ্রুত চিনতে পারা, বুঝতে পারা এবং গ্রহণ করতে পারার শক্তিই আসলে ধন্যবাদযোগ্য।' আহমদ মুসা বলল।

'না ছোট ভাই, বিশ্বাস অশরীরী বস্তু।  ওকে দেখা যায় না, চেনা যায় না। এই অশরীরী গুণাত্বক বস্তুটি শরীরী রূপ নিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মানুষের মধ্যে। আপনার মধ্যে আপনার ধর্মকে এমন জীবন্ত ও পরিপূর্ণরূপে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শতদিন শত মাসের গড়া, দেখা ও অনুভব শত ঘন্টায় আমাদের হয়ে গেছে। ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে ঢুকে অনেক মুসলমানকে আমরা দেখেছি, কিন্তু বিশ্বাসের এই রূপ আমরা দেখিনি। তাই তাদের দিখে চোখ ফিরানোরও সুযোগ হয়নি। শিক্ষার চেয়ে দৃষ্টান্ত বড়় শিক্ষার মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকে না, কিন্তু দৃষ্টান্তের মধ্যে শিক্ষাও থাকে। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যমুখী পরিবর্তনের জন্যে ধন্যবাদ আপনারই প্রাপ্য।

'ওয়েলকাম ভাই সাহেব। এখন...।' কথা এগুতে পারল না। আমহদ মুসা। থেমে যেতে হলো।

সুষ্মিতা বালাজী উঠে দাঁড়িয়ে কথার মাঝখানে বলে উঠেছে, ‘আসুন আমরা একসাথে প্রার্থনা করি। আপনার নামাজে দেখে নামাজের ট্রেনিং আমাদের হয়ে গেছে। ইন্টারনে থেকে ওজু ও নামাজের নিয়ম কানুন শিখছি, আরবীও শিখছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ আমরা পড়তে শুরু করিনি। আনুষ্ঠানিক শুরুটা আপনিই উদ্বোধন করে দিয়ে যান।’

বলে সুষ্মিতা বালাজী ছুটে গিয় পরিস্কার সাদা চাদর বিছানোর কাজে লেগে গেল।

আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দও উঠে দাঁড়াল।

দু’জন ওজুর জন্যে এগুচ্ছিল। ড্যানিশ দেবানন্দ বলল, ‘ছোট ভাই আপনি হয়তো কতকটা রসিকতা করেই এই উপত্যকায় আলো জ্বালাদার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কার্যক্রম আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমি একটা মহান কাজ পেয়ে গেছি ছোট ভাই। আমি খুশি হয়েছি।’

‘আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

তারা ওজুর জন্যে দু’জন দু’বেসিনে চলে গেল।

পোর্ট ব্লেয়ারের বন্দর এলাকার কয়েক মাইল দক্ষিণে এবং কালিকট শহর এলাকার কয়েক মাইল উত্তরে এক নির্জন উপকূলে বোট নোঙর করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা বোটটি টেনে উপরে তুলে একটা আড়ালে ঠেলে দিল। মনে মনে বলল, বোটটি শুধু অত্যন্ত সুন্দরই নয়, এর ইঞ্জিন অত্যান্ত পাওয়ারফুলও।

বোটটি ড্যানিশ দেবানন্দদের। ওদের মোট তিনটি বোটের মধ্যে সবচেয়ে ভালটাই আহমদ মুসাকে ওরা দিয়ে দিয়েছে। ওদের সাথে শলাপরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করে সে নৌ পথে আসার সিদ্ধান্ত নেই। হেলিকপ্টার যোগাগের সুযোগ ঐ সময় তাদের ছিল না। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে আসার মতো রোড-কম্যুনিকেশণ নেই। আর ঐ রাতে ভাড়া গাড়িও মিলত না। এ প্রশ্ন তুলে সুষ্মিতা বালাজীই প্রস্তাব করে মটর বোটে নৌ পথে আসার।

এসব ভাবতে গিয়ে মনে ভেসে উঠল সুষ্মিতা বালাজীর ছবি। বিদায়ের সময় বোটটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েছিল সুষ্মিতা বালাজীদের। সুষ্মিতা বালাজী কান্নাচাপা কণ্ঠে বলেছিল, 'বোটটার দামটাই যদি এভাবে চুকাতে চান তাহলে সম্পর্কটা ছিন্ন করে যান।'

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলতে পারেনি। 'স্যরি আপা' বলে সালাম দিয়ে বিদায় নিয়েছে।

স্পীড বোটটি উভচর। আহমদ মুসা বোট চালিয়ে তীরে উঠে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে বাইরে বের হয়ে আসার আগে অভ্যাসবশতই একটু স্পর্শ করে নিল পকেটে রিভলবারটা ঠিকঠাক আছে কিনা। আরেকটা ছোট্ট বিললবার আছে মোজার ভেতরে গুঁজে রাখা।

আহমদ মুসা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাল। শংকরাচার্যের নির্দেশনা অনুসারে উপকূল থেকে সামনে তাকালে দেখা যাবে

বিশাল মরা একটা মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সে গাছটি ডানে রাখলে পাহাড়ে যে আঁকা-বাঁকা গলিপথ পাওয়া যাবে সেটা ধরে এগুতে হবে দু'আড়াই মাইল। গলিপথের একবারে নাক বরাবর মাথায় পাওয়া যাবে একটা ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর মন্দির এবং মন্দিরের মাথায় একটি গৈরিক পতাকা। সে মন্দিরের উত্তর পাশে একটা 'সাদা মাইক্রো' দাঁড়ানো থাকবে। সেই মাইক্রোর খোলা দরজার সামনে হাত তুলে দাঁড়াতে হবে। দু'জন লোক বড়ি সার্চ করবে। তারপর উঠে বসতে হবে গাড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সকাল ৮টায়।

আহমদ মুসা সামনে তাকিয়েই দেখতে পেল সেই মরা গাছ।

এগুতে লাগল আহমদ মুসা সেই গাছ লক্ষ্যে।

কয়েক গজ এগুতেই একটা গাড়ির শব্দ পেল আহমদ মুসা। শব্দটা আসছে সেই মরা গাছটির বাম দিক থেকে।

আহমদ মুসা একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। আড়াল থেকে দেখতে পেল একটা নীল রঙের প্রাইভেট কার আসছে।

প্রাইভেট কারটি তার সামনে দিয়েই চলে গেল উপকূলের দিকে। ড্রাইভিং সীটের একজনকেই সে দেখতে পেল। লোকটির মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে টি সার্ট। তাকে দেখে ভদ্রলোক মনে হলো না।

এই নির্জন উপকূলে লোকটি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

কৌতুহল দমন করতে পারলো না আহমদ মুসা। ঝোপের আড়াল ধরে গাড়ির পিছু পিছু ছুটল সে। উপকূল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল গাড়িটি।

গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভিং সীটের লোকটি। পেছনের সীটের দরজা খুলল। ভেতর থেকে পেনে বের করে আনল একজন লোককে। তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলল পানির দিকে।

আহমদ মুসা দেখল, লোকটি একজন স্বাস্থ্যবান যুবক। যুবকটি মৃত না সংজ্ঞাহীন বুঝতে পারলো না আহমদ মুসা। তাকে পাঁজাকোলা করে সাগরের দিকে নিয়ে যেতে দেখে ভাবল, লাশ সাগরে ফেলে দিতে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু আবার প্রশ্ন জাগল, লাশ শুধু সাগরে ফেলার জন্যে এতদূরে আনার দরকার কি!

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল আন্দামানে ডজন ডজন লোককে সাগরে ডুবিয়ে মারার কথা।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। তাহলে লোকটি কি সংজ্ঞাহীন? তাকে মেরে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছে?

আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিল। বের হয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

লোকটি তখন পানির ধারে চলে গেছে। ফেলে দিয়েছে সংজ্ঞাহীন লোকটিকে পানিতে। তারপর এগিয়ে যাচ্ছে পানিতে পড়া লোকটির দিকে।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না লোকটি এখন কি করতে চায়। সংজ্ঞাহীন লোকটিকে ডুবিয়ে রাখলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মুত্যু ঘটবে। প্রমান হবে সে পানিতে ডুবে মারা গেছে।

গুলী করল আহমদ মুসা লোকটির হাঁটু লক্ষ্যে।

সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার থেকে নিঃশব্দে বের হওয়া গুলী গিয়ে আঘাত করল লোকটির হাঁটুতে। লোকটি পেছনে ছিটকে এসে পড়ল উপকূলের মাটিতে।

গুলী করেই দৌড় দিয়েছে আহমদ মুসা উপকূলের পানির দিকে।

গুলী খেয়ে আহত লোকটি বাঘের মত চোখে সমস্ত বিষ ঢেলে তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে।

'যেমন আছ ঠিক পড়ে থাক' বলে তার কোমরের বেল্টের রিভলবার খুলে নিয়ে সংজ্ঞাহীন লোকটিকে পানি থেকে তুলে আনল। তুলে আনতে গিয়ে আহমদ মুসা উপকূলটির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করল। উপকূল ঢালু হয়ে পানি স্পর্শ করেছে, তারপর দু'তিন গজ পরেই হঠাৎ খাড়া হয়ে নিচে নেমে গেছে। পানির রং ঢেউয়ের প্রকৃতি দেখে বুঝা যায়, সাগর অত্যন্ত গভীর। আরও লক্ষ্য করল, পানি বরাবর উপকূলের মাটিগেরুয়া রঙ্গে রাঙা। এখানে পূজাও হয় নাকি?' ভাবল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার খেয়াল হলো, 'ইমাম ও শিক্ষক ইয়াহিয়া আহমদুল্লার লাশও তো এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। পানিতে ডোবা আগের

লাশগুলোও এখানে বা এ ধরনের স্থানেরই কি পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে লাশগুলোকে কি সাগর দেবতাকে অর্ঘ হিসাবে পেশ করা হয়।

আহমদ মুসা লোকটিকে এসে তীরে শুইয়ে দিল। লোকটার গোটা শরীর ভিজে গিয়োছিল। এই ভিয়ে যাওয়াটা তার সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা এগিয়ে গেল খুন করতে আসা লোকটির দিকে।

লোকটি আহত হাঁটু ধরে বসেছিল।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই বলে উঠল, 'তুই কে জানি না। কিন্তু যা করছিস তাতে তোকে মরতে হবে।'

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তার দু'হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে পানির কিনারা থেকে অনেকটা উপরে নিয়ে এল। তার কপালে রিভলবার চেপে বলল, 'কিভাবে কেন মরতে হবে বল, তারপর ভাবব তোকে মারব কিনা।

'শুধু তোকে নয়, যাকে মারতে নিয়ে এসেছিলাম তাকেও মরতে হবে। আমাদের হাত থেকে কেউ ছাড়া পায়নি। বাঁচার উপায় তারও নেই।' বলল নির্ভিক কণ্ঠে।

আহমদ মুসা তার কপাল থেকে রিভলবারের নল একটু সরিয়ে গুলী করল লোকটির কানের বাইরের প্রান্ত লক্ষ্যে।

কানের একটা অংশ ছিঁড়ে গুলী চলে গেল।

লোকটি আর্তচিৎকার করে কান চেপে ধরল। এবার তার চোখে-মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল। বিস্ফোরিত চোখ তুলি তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে।

গুলী করেই আহমদ মুসা রিভলবার নল ফিরিয়ে এনে তার কপালে চেপে ধরল। বলল, 'ঠিকতম উত্তর না দিলে এবার মাথা গুড়ো হয়ে যাবে। বল, তোরা কারা? কে তোদের নেতা? কি দোষ ঐ লোকটির?'

লোকটির চোখে-মুখে মৃত্যু ভয় উৎকটভাবে ফুটে উঠেছে। বলল,'নেতা কে আমি জানি না। আমাকে নির্দেশ দিয়েছে মহাগুরু শংকরাচার্য।'

আহমদ মুসাও এই উত্তরই আশা করছিল। বলল, 'এখন বল এই লোকটির দোষ কি? কে তাকে হত্যা করতে নিয়ে এসেছিলি?'

'আমি সেটা জানি না স্যার। সত্যি বলছি। আমি শুধু একটা নির্দেশ পালনের জন্যেই এসেছিলাম।'

'শংকরাচার্য কোথায়?'

'আমি জানি না স্যার। লর্ড মেয়ো রোডের প্রত্নতত্ব অফিসের সামনে দাঁড়ানো গাড়ি নিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। এই ছেলেটি ঐ গাড়িতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল।'

পুরাতত্ব অফিসের নাম শুনেই আহমদ মুসার মনে পড়ে গেল ড্যানিশ দেবানন্দের কথা। পুরাতত্বের সব অফিসকেই 'শিবাজী সন্তান সেনা'র তাদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে। সুতরাং 'লর্ড মেয়ো রোড'-এর ঐ আস্তানা শংকরাচার্যের একটা ঘাঁটি  হতে পারে। সংজ্ঞাহীন ছেলেটির ওখান থেকে নেয়ার অর্থ হলেঅ, সংজ্ঞাহীন ছেলেটির জ্ঞান ফিরলে তার কাছ থেকেও কিছু জানা যেতে পারে। এ চিন্তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা এ লোকটির পকেটে খোঁজ করে মোবাইল নিয়ে ফিরে এল সংজ্ঞাহীন ছেলেটির কাছে।

সংজ্ঞা এখনও ফেরেনি ছেলেটির।

ছেলেটির বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর। আরবীয় আরয চেহারা। ফর্সা রং, কাল চুল, টানা চোখ, উন্নত নাক। গায়ে হালকা নীল সার্ট, পরণে নীল প্যান্ট। সব মিলিয়ে একটা অভিজাত চেহারা। বুঝাই যাচ্ছে মুসলমান।

তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফেরানো দরকার। কি করা যায় এখন।

হঠাৎ মনে পড়ল আহম মুসার, ঐ লোকটার পকেটে মোবাইল এবং আরও অস্ত্র আছে কিনা খঁজে দেখার সময় একটা ছোট শিশিতে মদ দেখেছে।

কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা ছুটে গেল এবং লোকটির পকেটে থেকে মদের শিশি এসে ছিপি খুলে ছেলেটির নাকের সামনে ধরল।

নিঃশ্বাসের সাথে স্পিরিটের তীব্র গন্ধ প্রবেশ করল ছেলেটির নাক দিয়ে ভেতরে। নড়ে উঠল তার দেঞও। মুহূর্ত কয়েক পর ছেলেটি চোখ খুলল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। চারদিকে তাকাল সঙ্গে সঙ্গেই।

চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে আবার। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'আমি এখানে কেন? আপনি কেন? ওরা গেল কোথায়?'

‘ওরা মানে যারা তোমাকে ধরেছিল তারা?

‘জি, হ্যাঁ।’

‘ওরা তোমাকে সংজ্ঞাহীন করে একজনকে দিয়ে পাঠিয়েছিল সাগরে তোমাকে ডুবিয়ে মারা জন্যে। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমাকে বাঁচিয়েছি। বাঁ দিকে যে লোকটি পড়ে থাকতে দেখলে, সেই এনেছিলো তোমাকে পানিতে ডোবানোর জন্য। ওর হাঁটুতে আমি গুলী করেছি।’

‘আপনি কে? দেখে তো এশিয়ারই বলে মনে হচ্ছে।’ ছেলেটি উঠে বসতে বসতে বলল।

‘বলব সব, এখনি ওদিকে একটু চল। ওর সামনে সব কথা বলা যাবে না।’

বলে আহম মুসা উঠে দাঁড়াল এবং ছেলেটিকেও উঠতে সাহয্য করল। তারপর আহত লোকটির দিকে একটু ঘুরে বলল, ‘তুমি যেভাবে পড়ে আছ, সেভাবে থাকবে। পালাতে পারবে না, কিন্তু মরবে তার ফলে।’

আহমদ মুসা গাড়ির সিটে উঠল। পাশের সীটে উঠতে বলল ছেলেটিকে।

ছেলেটি উঠে বসলে আহমদ মুসা বলল, ‘এই গাড়িতে করেই তোমাকে নিয়ে এসেছিল।’

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেটির দিকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে দ্রুত বলল, ‘দেখ আমার হাতে সময় খুব কম। দ্রুত উত্তর দেবে। প্রথম প্রশ্ন, তুমি মুসলিম নিশ্চয়। তুমি কি জান কারা তোমাকে ধরেছিল, কারা খুন করতে চায় এবং কেন?’

‘দুঃখিত, এই প্রশ্নগুলোর কোনটিরই উত্তর আমার জানা নেই।’

ছেলেটি একটা থেকে একটা ঢোক গিলেই আবার বলে উঠল, ‘কিন্তু আপনি জানলেন কি করে আমি মুসলামান?’

‘পরে বলব। আগে প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কালকে বিদেশ থেকে এসেছ। তুমি ঐ পুরতত্ব অফিসে কেন গিয়েছিলে? কেন তোমাকে ওরা ধরল?’

‘আপনি কি করে জানলেন আমি কালকে বিদেশ থেকে এসেছি। আপনাকে কখনই দেখিনি আমি।’ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল ছেলেটি।

‘পরে বলব, তুমি প্রশ্নের উত্তর দাও।’ গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

ছেলেটি তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার ব্যক্তিত্বের কাছে মুষড়ে পড়ল সে। বুঝল বাড়তি প্রশ্ন করা তার ভুল হয়ে গেছে। বলল সে ‘স্যরি স্যার। পুরাতত্ব বিভাগে আমার বন্ধু চাকরি করে। থাকেও সে অফিস সংলগ্ন বাড়িতে। আমি তারই খোঁজে গিয়েছিলাম।’

‘তারপর।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তখন অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অফিসের উত্তর পাশের অংশের বাড়িটাতেই আমার বন্ধু থাকতো। আমি দরজায় নক করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ দরজা খুলল না। বুঝলাম বাসায় কেউ নেই। হতাশ হয়ে কি কি করব ভাবছি। এমন সময় একটা মাইক্রো এসে বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে পাঁচ-ছয় জন নামল। তারা দু’জন মহিলাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। মহিলা দু’জনের মুখ টেপ লাগিয়ে বন্ধ করা। আমি দু’জন মহিলাকে চিনতে পারলাম। ছুটে গেলাম তাদের দিকে। বললাম, ‘কি দোষ এদের? আমি এদের চিনি। ওদের ছাড়ুন। শুনুন আমার কথা।’

ওদের মধ্যে লম্বা-চওড়া সর্দার গোছের একজন ওদের আগে আগে যাচ্ছিল। আমার কথা শুনেই সে দু’জনকে নির্দেশ দিল আমাকে ধরার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই দু’জন এসে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এসব ব্যাপার এত দ্রুত ঘটে গেল যে, আমার প্রতিরোধ করার সুযোগ হল না।’

‘ঐ দু’জন মহিলা কি একজন শাহ্ বানু, আরেকজন সাহারা বানু?’’

‘হ্যা। আপনি জানলেন কি করে?’ ছেলেটির চোখ বিষ্ময়ে-বিষ্ফারিত।

‘পরে বলব। উত্তর দাও প্রশ্নের।’

‘স্যরি স্যার। হ্যাঁ মহিলা দু’জন ওরাই ছিলেন।’

আহমদ মুসা দ্রুত ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল, ৮টা বাজতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ভাবল সে, আমরা এখন সরাসরি সেই পুরাতত্ব অফিসে অভিযান চালাতে পারি। শংকরাচার্য ৮টার সময় জানবে যে আমি তাদের ফাঁদে পা দেইনি। এ খবর যে জানার আগেই আমরা তার কাছে পৌছে যাব। সুতরাং শাহ্ বানুদের উপর চড়াও হবার তাদের কোন সুযোগ

হবে না। অন্য কোনভাবে এ খবর সে আগে-ভাগে জানবে তারও সম্ভাবনা নেই। এই উপকূলে তাদের যে পাহারা নেই, তা বুঝাই যাচ্ছে। তাবে একটা প্রশ্ন আহমদ মুসার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল, আমাকে এই উপকূলে মেরে ফেলার জন্যে। কেন?

চিন্তা করেই আহমদ মুসা চোখের পলকে গাড়ি ঘুরিয়ে সেই আহত লাকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়ির জানালা দিয়ে লোকটির দিকে রিভলবার তাক করল।

লোকটি আর্তকণ্ঠে বলল, 'আমাকে মারতে পারে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আমি একজন হুকুম তামিলকারী মাত্র।'

'ঠিকআছে, গুলী করব না। কিন্তু একটা কথা বল, এই ছেলেটিকে হত্যা করার জন্যে শংকরাচার্য কি তোমাকে এই ঘাটেই আসতে বলেছিল, না অন্য কোথাও।' বলল আহমদ মুসা শান্ত কিন্তু শক্ত কণ্ঠে।

'আমার উপর নির্দেশ ছিল ঘাটে নিয়ে একে ডুবিয়ে মারার। অনেকগুলো ঘাট আছে। আমি এই ঘাটে এসেছি কারণ ঘাটটিতে আসার রাস্তা আরও দু'টি কাছের ঘাটের চেয়ে অনেক ভাল।'

'আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, যেখান থেকে গাড়ি নিয় এসেছ, সেই পুরাতত্ব অফিসে কখনও ঢুকেছ?'

'অনেক বার ঢুকেছি স্যার।'

'অফিসে কি আন্ডার গ্রাউন্ড কক্ষ আছে?'

'আছে স্যার। বাড়িটার অফিস অংশের উত্তর ও দক্ষিণ দু'পাশে দু'টি আবাসিক অংশ আছে। ঐ দু'অংশে দু'টি আন্ডার গ্রাউণ্ড কক্ষ আছে।'

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা গাড়ি আবার ঘুরিয়ে নিল। তার পর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে বলল, 'গাড়ি আমি নিয়ে গেলাম, সাড়ে ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, গাড়ি পেয়ে যাবে।'

গাড়ি ষ্টার্ট দেয়ার আগে আহমদ মুসা ব্যাগ থেকে একটা ছোট ব্যান্ডেজ প্যাকেট লেকটির দিকে ছুড়ে দিল।

গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

'স্যার, এখানে আসবে কি ওকে গাড়ি ফেরত দেবার জন্যেই?' বলল ছেলেটি।

'সবই জানতে পারবে। আমার আরও প্রশ্ন আছে।'

ছেলেটি একবার আহমদ মুসারি দিকে তাকিয়ে চুপ করল। মনে মনে বলল, কি বিস্মকর মানুষরে বাবা! সবজান্তার মত সবকিছুই জানে। চেহারা, চোখ-মুখ থেকে বুঝা যাচ্ছে খুব ভাল একজন মানুষ। কিন্তু রিভলবার হাতে নিলে মনে হচ্ছেতার কোন দয়া-মায়া নেই। আবার ব্যান্ডেজ দিয়ে আসা থেকে বুঝা যায় তার দয়া-মায়া আছে। আর তার সাথে একজন রাশভারী বড় ভাইয়ের মত অথবা একজন সেনা কমান্ডারের মত ব্যবহার করছে, তার শুধু হুকুমই পালন করতে হবে, প্রশ্ন করা যাবে না। তবে হুমুকের মধ্যে হৃদয়ের স্পর্শ আছে। ভাল লাগছে হুকুম তামিল করতে। বাঁচিয়েছে বলেইয়, তাকে দেখে এবং কথা শুনেই মনে হচ্ছে সে একজন হৃদয়বান অভিভাবক।

ছেলেটির ভাবসা ভেঙে দিয়ে উচ্চারিত হল আহমদ মুসার কণ্ঠস্বর। আমার তার প্রশ্ন ছেলেটিকে, 'তুমি শাহ্ বানুদের চেন কিভাবে?'

'শাহ্ বানুদের সাথে আমার ছোটবেলা থেকে পরিচয়। ওরা ভাই আহমদ শাহ্ আলমগীর আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমাদের উভয় পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আমাদের বাড়ি পোর্ট ব্লেয়ারে। সেকেন্ডারী পাস করার পর আমি পড়ার জন্য লন্ডন চলে যাই। পরে আমার আব্ব-আম্মাও লন্ডন চলে গেছেন। ওখানেই সেটেলড। প্রতিবছর ছুটিতে আমি এখানে আসি। আমাদের পোর্ট ব্লেয়ারের বাড়ি ভাড়া দেয়া আছে। আমি শাহ্ বানুদের বাড়িতেই উঠতাম। আহমদ শাহ্ আলমগীর নিখোঁজ হওয়ার খবর আমি সাত আটদিন আগে পেয়েছি। খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি। প্লেন থেকে নেমে সোজা শাহ্ বানুদের বাসায় চলে যাই। শাহ্ বানুদের পায়নি। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারল না। পুরাতত্ব অফিসের আমার সেই বন্ধু আহমদ শাহ্ আলমগীরের ভাল বন্ধু। এ জন্যেই তার কাছে গিয়েছিলাম সে কিছু বলতে পারে কিনা জানার জন্যে।'

'শুধু তাদের খোঁজ নেবার জন্যেই লন্ডন থেকে এসেছ?''

‘জি হ্যাঁ। একদিকে আহমদ শাহ্ আলমগীরের চিন্তা অন্যদিকে তার পরিবারের চিন্তা আমাকে উদ্বগ্ন করে তুলেছিল।’

‘এখন তুমি মুক্ত, কি করবে চিন্তা করেছ?’

‘আমি গতকাল যা দেখেছি সে ব্যাপারে পুলিশকে খবর দেব। পুলিশকে নিয়ে ঐ বাড়িতে যাব।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জান সবচেয়ে সংরক্ষিত আন্দামানের গভর্নরের বাড়িতে তাদেরকে রেখেছিলাম। সেখান থেকে তাদের কিডন্যাপ করা হয়েছে। পুলিশের সহযোগতা ছাড়া এটা হয়নি।’

‘ছেলেটির চোখে-মুখে অনেক কৌতুহল ও অনেক প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে প্রশ্নের জন্যে মুখও খুলেছিল। কিন্তু চেপে গেল। ধীরে ধীরে তার চেহারায় ফুঠে উঠল হতাশার চিহ্ন। বলল, ‘তাহলে কি হবে?’

‘কেন, উদ্ধারে আমরা যেতে পারি না?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি, আপনি দু’জনে?’ বলল ছেলেটি বিস্ময়ে চোখ কপাল তুলে।

‘কেন তুমি গুলী চালাতে জান না?’

‘রিভলবার, বন্দুক হাতে নিলেও কোন মানুষকে লক্ষ্য করে কোন দিন গুলী করিনি।’

‘তাহলে শাহজাদী উদ্ধার হবে কিভাবে? আর কিছুটা অন্তত যুদ্ধ করতে না জেনে তুমি মোগল পরিবারের জামাই হবে কি করে।’ আহমদ মুসার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি।

ছেলেটি চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে-মুখে প্রথমে বিব্রতভাব, তারপর লজ্জায় ঢেকে গেল তার চেহারা। পরে লজ্জা সরে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল যন্ত্রণার একটা ম্লানিমা। বলল, ‘স্যার আপনি বিস্মকর এক মানুষ। আপনি অবশ্যই সব জানবেন। আপনি ঠিকই বলেছেন। যে যুদ্ধ জানে না, সে একজন শাহজাদীকে জয় করবে কি করে? এই কথাটা এতদিন আমি বুঝিনি বলেই মনে কষ্ট পেয়েছি স্যার।’

ছেলেটির মনে যন্ত্রণা আহমদ মুসাকেও স্পর্শ করল। বেদনার একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল সে, 'আমি ওটা রসিকতা করে বলেছি। তুমি শাহ্ বানু......।' কথা শেষ করতে পারলনা আহমদ মুসা।

ছেলেটি বলল, 'ঠিক স্যার।'

'আসলে সে কি জানে তুমি তাকে কামনা কর?'

'অবশ্যই সে বুঝে স্যার। কিন্তু সব সময়ই সে পাথরের মত ঠাণ্ডা। তার সাথে কথা-বার্তা সবই হয়। কিন্তু তার চোখে কোনদিন বিশেষ দৃষ্টি দেখিনি। খুব সাধারণ চোখে সে আমকে দেখে থাকে।' বলল ছেলেটি ম্লান কণ্ঠে।

'আচ্ছা থাক এ প্রসঙ্গ। তুমি ভেব না, আমি দেখব ব্যাপারটা। এখন বল তোমর নাম কি?' তোমর পরিচয়ই তো জানা হয়নি।'

'আমার নাম তারিক মুসা মোপলা। বলল ছেলেটি।

'বাঃ সুন্দর নাম। আমার নামের সাথে মিল আছে। আবার তোমার নামের সাথে ইসলামের দু'মহান সেনাপতি 'তারিক' ও 'মুসা'র নাম যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বল 'মোপলা' শব্দটা যোগ হল কেন? তোমরা দক্ষিণ ভারতের মালাবার (কেরালা) অঞ্চলের মোপলা জনগোষ্ঠীর বলেই কি?'

'তা তো বটেই স্যার। তাছাড়া আরও একটা দিক আছে। আব্বা বলেন, গৌরবময় একটা স্মারক হিসেবে মোপলা নামটা আমরা ধারণ করে আসছি। মোপলা শব্দটি মূলত 'মক্কা পিল্ল'। যার অর্থ মক্কাবাসী। আমাদের পূর্ব পুরুষরা মক্কা থেকে ব্যাবসায় ও ধর্ম প্রচারের মিশন নিয়ে এসে মালাবার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তারা 'মক্কা পিল্ল' বা 'মক্কাবাসী' হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত হতেন। মক্কা পিল্লাই আজকের 'মোপলা'। মোপলা নাম ধারণের মাধ্যমে মহান এক অতীতকে জীবিত রাখতে চাই আমরা।'

'তোমরা আন্দামানে কেন? তোমাদের পূর্ব পুরুষরা বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে যুক্ত ছিল সেজন্যে?

'আমার দাদা এবং তাঁর আরও এক চাচা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে দীপান্তর দণ্ড লাভ করে ১৯২২ সালে আন্দামানে আসেন। আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ আলী মোপলা ছিলেন মালাবারের এক প্রভাবশালী সর্দার।

আমাদের বাড়ি ছিল মালাবারের তখনকার এক বন্দর 'মুজিরিস' (কেন্নানুর) শহরে। আমার দাদার আব্বা উক্ত আবদুল্লাহ আলী মোপলা মালাবারের ওয়ালুভানদক অঞ্চল থেকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এভাবে একেকটা অঞ্চল একেকজন সরদারের হাতে দেয়া হয়েছিল। শুরুতেই বৃটিশরা ওয়ালুভানদক থেকে আমার দাদার আব্বা এবং এরনাদ অঞ্চলের সর্দারকে গ্রেফতার করে। তার ফলে যুদ্ধ দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এরনাদ ও ওয়ালুভানদক তথা গোটা মালাবার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যুদ্ধ শেষে যে এক হাজার জনের ফাঁসি হয় তাদের মধ্যে আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ আলী মোপলা ছিলেন। হাজার হাজার নিহতের মধ্যে আমার দাদার আব্বার তিন ভাই ছিলেন। গোটা পরিবারের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল আমার দাদার আব্বা এবং তার এক চাচা। তারা আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। মালাবারের দুই হাজার মোপলা মুসলমান দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করে আন্দামানে আসেন।'

'শাহ বানুর মা সাহারা বানুও তো মোপলা মেয়ে।'

'জ্বি স্যার। ১৯২১ সালে মালাবারে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে যুদ্ধ সংগঠিত করার অভিযোগে মালাবারের এরনাদ এলাকার যে সরদারকে গ্রেপ্তার করা হয় তার নাম আবু বকর আবদুল্লাহ। তারও ফাঁসি হয়। তার ছেলে ওমর ফারুক আবদুল্লাহ আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। এই ওমর ফারুক আবদুল্লাহরই নাতনি মুহতারামা সাহারা বানু।'

'সাহারা বানু তো ইরানী নাম। অবশ্য জানি না মোগল বা মোপলাদের মধ্যে এ ধরণের নাম আছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

'মোগলদের মধ্যে আছে স্যার। মোপলাদের মধ্যে নেই। আসল ব্যাপার হলো মুহতারামা সাহারা বানুর আব্বা হায়দরবাদে পড়ার সময় একজন ইরানী সহপাঠিনীকে বিয়ে করেন। সেখোন থেকেই মোপলাদের মধ্যে এ নাম এসেছে।'

'ধন্যবাদ তারিক। তোমার কাছে অনেক কিছু জানলাম। শাহ বানুদের এত কিছু জিজ্ঞাসার সুযোগ হয়নি।'

বলে আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়েছি তারিক। তোমার বন্ধুর সেই পুরাতত্ব অফিসে শংকরাচার্য ও শাহ বানুদের

পেতেই হবে। তা না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি দু'কুলই হারাবো।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

উদ্বেগ দেখা দিল তারিকের চেহারায়। বলল, 'আমি জানতে পারি কি ঘটনা?'

'হ্যাঁ জানতে পার' বলে আহমদ মুসা সংক্ষেপে তার আন্দামানে আসার উদ্দেশ্য এবং এ পর্যন্ত কি ঘটেছে তার বিবরণ দিয়ে বলল, গতকাল রাতে শংকরাচার্য আমাকে হুমকি দিতয়েছে আমি যদি আজ সকাল ৮টায় তাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করি, তাহলে শাহ বানু ও সাহারা বানুদের লাঞ্চিত করা হবে, তাদের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে। আমি আত্মসমর্পণের জন্য তাদের নির্দেশিত জায়গা ঐ উপকূলে সকালেই এসে নেমেছি। ওখান থেকে দু'আড়াই মাইল পশ্চিমে একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা গাড়ি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাতে ঠিক ৮টায় গাড়িতে গিয়ে শংকরাচার্যের লোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ঐ গাড়ি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে শংকরাচার্যের কাছে। আমি উপকূলে নেমে ঐ গাড়ির দিকেই যাত্রা করেছিলাম। এমন সময় তোমার ঘটনা ঘটল। তোমাকে যে পদ্ধতিতে ওরা হত্যা করতে চেয়েছিল, সেটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল শংকরাচার্য এ ঘটনার সাথে জড়িত। তারপর যখন আহত ঐ লোকটির কাছ থেকে শুনলাম পুরাতত্ব অফিস থেকে তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছে, তখন আমার সন্দেহ দৃঢ় হলো। পরে তোমার কাছ থেকে নিশ্চিত জানলাম যে শাহ বানু ও সাহারা বানুকে ঐ পুরাতত্ব অফিসেই তোলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি আত্মসমপর্ণের সিদ্ধান্ত বাতিল করে আত্মসমপর্ণের সময়ের আগেই শাহ বানুদের উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন আত্মসমপর্ণের সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিনি, এ খবর শংকরাচার্যের কাছে পৌঁছার আগে আমাদের শাহ বানুদের কাছে পৌঁছতে হবে। ওদের না পাওয়ার কথা ভাবতেই পারছিনা আমি।'

তারিক অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার মুখের দিকে। সব আতংক, বিসস্ময় ও বিমুদ্ধতা এসে ঘিরে ধরেছিল তারিক মুসা মোপলাকে। সে আতংকিত হয়ে পড়েছিল শাহ বানুদের সম্ভাব্য পরিণতির কথা শুনে। বিস্মিত

হয়েছিল আন্দামানে আহমদ মুসার রোমঞ্চকর কাহিনী শুনে। বিমুগ্ধ হয়েছিল শাহ বানুদের স্বার্থে নিজেকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার আহমসদ মুসার ত্যাগ দেখে।

আহমসদ মুসার থামার পরেও অনেকক্ষণ কথা যোগালনা তারিকরে মুখে। একটু পর বলল, 'স্যার, রাতে ওরা অবশ্যই ওখানে ছিল। এত সকালে কোথাও স্থানান্তর করার কথা নয়, বিশেষ করে যখন আপনার সকাল ৮টায় আসার কথা। এখন মনে পড়ছে স্যার, ক্লোরোফরম করে আমাকে সংজ্ঞাহীন করা হয় সকালে। তার আগে একজন লোক আমাকে বলেছিল, তুই মরতে এসেছিলি কেন? যাদের বাঁচাতে এসেছিলি, তারা কিন্তু বেঁচে আছে, মরতে হবে তোকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওদের কোন ক্ষতি হবে না তো? লোকটি বলেছিল, ওদের বাঁচিয়ে রাখা হবে অবশ্যই। ধরা হয়েছে বড় টোপ হিসেবে। টার্গেট শিকার না হওয়া পর্যন্ত তারা থাকবে। সুতরাং আমি মনে করি স্যার, ওঁদের পাওয়া যাবে।'

'তোমার কথা সত্য হোক।' বলল আহমদ মুসা।

গাড়ি প্রবেশ করেছে পোর্ট ব্লেয়ার শহরে।

প্রবেশ করল লর্ড মেয়ো রোডে।

কিছুক্ষণ চলার পর তারিক বলল, 'আমরা এসে গেছি স্যার। সামনে বাঁ দিকের পুরনো বাড়িটাই পুরাতত্ব অফিস। বৃটিশ আমলে এই বাড়িটা ছিল আঞ্চলিক গোয়েন্দা অফিস।'

আহমদ মুসা বাড়িটা থেকে ২শ গজ দক্ষিণে একটা বাড়ির সামনে রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়ানো কাঁঠাল জাতীয় একটা গাছের নিচে গাড়ি দাঁড় করাল। সেখান থেকে পুরাতত্ব অফিস বাড়িটার পেছনে দিকেরও অনেকখানি দেখা যায়। আহমদ মুসা একটু ভেবে নিয়ে বলল, অফিস বিল্ডিংসহ দু'টি আবাস গৃহের কোনটিতে কি পেছনে ইমারজেন্সী এক্সিটের মত কোন দরজা আছে?'

তারিক মনে করার চেষ্টা করে বলল, 'স্যরি। আমি জানিনা। বাড়িগুলোর পেছনের দিকে কোন সময় যাওয়া হয়নি।'

'অল রাইট। আমি খুঁজে নেব। থাকলে পাওয়া যাবে।'

একটা বাক্যে কথাটার ইতি টেনে আহমদ মুসা পায়ের মোজায় গুঁজে রাখা এবং পকেটে রাখা দু'টি রিভলবার বের করে দেখল সম্পূর্ণ গুলি ভর্তি আছে

কিনা। তারপর উপকূলে আহত লোকটার কাছ থেকে নেয়া রিভলভারটিতেও পাঁচটা গুলি ঠিকঠাক রয়েছে দেখল। এই রিভলবারটি আহমদ মুসা মাথার নিচে ঘাড়ে জ্যাকেটের কলারের বিশেষ পকেটে রাখল। কাজটা শেষ করে ঘুরল তারিকের দিকে।

তারিক অপলক চোখে আহমদ মুসার যুদ্ধসাজ দেখছে। তার মুখ বিস্ময় ও উদ্বেগে ভরা।

আহমদ মুসা নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'শোন তারিক, এখন ৭টা বেজে ৩৫ মিনিট। তুমি ঠিক আটটার সময় পুরাতত্ব অফিস-বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে। এর মধ্যেই ইনশাআল্লাহ ফিরে আসব। আর যদি না..............।'

কথা শেষ করতে পারলনা আহমদ মুসা। তারিকের ডান হাত ছুটে এসে আহমদ মুসার মুখ চেপে ধরেছে। বলল তারিক, 'স্যার, অবশিষ্ট কথাটা বলবেন না। আল্লাহ এ রকম করবেন না।' অশ্রুতে ছল ছল করছিল তারিকের দু'চোখ। তার কথার সাথে দু'ফোটা অশ্রু গড়িঢে পড়ল তার দু'গণ্ড বেয়ে।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ঠিক আছে বললাম না।'

আহমদ মুসা তারিকের পিঠ চাপড়ে সান্তনার সুরে বলল, 'অশ্রু মুছে ফেল তারিক। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। ইসলামের মহান সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ নিজেদের সব জাহাজ পুড়িয়ে ফেলে পিছু হটার পথ বন্ধ করে স্পেনের রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। সেই সেনাপতির নামে তোমার নাম। তোমাকে ভাবতে হবে, ন্যায়ের স্বার্থে অন্যায়ের প্রতিবাদে গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমি শির উঁচু করে দাঁড়াব। মনে রেখ অশ্রু মানুষকে দুর্বল করে।'

'কিন্তু গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে বা পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই তো চলেনা।'

'লড়াই করার দরকার নেই। তুমি তাদের সাথে একমত নও, এটা জানিয়ে দিতে হবে। এটা্ই শির উঁচু করে দাঁড়ানো।'

'এতে কিন্তু বিজয় আসবেনা এবং অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না।'

'বিজয় আসবেনা, কিন্তু আখেরাতে তোমার মুক্তি নিশ্চিত হবে। বিজয়ের ভাবনা তোমার নয়, আল্লাহর। বিজয় দেয়ার সময় হয়েছে কি হয়নি, এটা ঠিক

করা একমাত্র তারই এখতিয়ার। এটা যদি তোমার ঈমান হয়, তাহলে দেখবে হতাশা কোন সময়ই স্পর্শ করবেনা তোমাকে এবং কাজ করার শক্তি ও উৎ'সাহ বহুগুণ বাড়বে। বিজয়ের চিন্তাই যে মানুষকে, বিজয় না আসা এ ধরণের মানুষদের দুর্বল ও হতাশাগ্রস্থ করে এবং এই হতাশাগ্রস্থততাই তাকে পথভ্রষ্ট করে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং তোমার দায়িত্ব শতভাগ পালন করেছ কিনা সেটা দেখবে। সবাই তার দায়িত্ব শতভাগ পালন যদি করে, তাহলে এক সময় আল্লাহর দেয়া বিজয় আপনাতেই এসে দ্বারে করাঘাত করবে।'

বলে আহমসদ মুসা সালাম দিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

সোজা ফুটপাতে উঠে গেল।

চলতে লাগল গাছতলা দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে।

পলকহীন চোখে তারিক তাকিয়ে আছে আহমদ মুসার দিকে। বুঝল সে, তার স্যার একটা দূরত্ব পর্যন্ত পশ্চিমে এগিয়ে তারপর পুরাতত্ব বাড়ির পেছনে যাবার পথ ধরবে।

তারিক ঘড়ির দিকে তাকাল। ৭টা ৩৭ মিনিট। আর ২২ মিনিট হাতে আছে। সামনে থেকে হর্নের শব্দ কানে এল তারিকের। ঘড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে তাকাল সামনের দিকে। দেখতে পেল, পুরাতত্ব বাড়ির সামনে একটা মাইক্রো এসে দাঁড়িয়েছে। তার দেখা গতকালকেরেই সেই মাইক্রোই।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তারিকের। সতর্ক হয়ে উঠল সে।

পরক্ষণেই মাইক্রো থেকে পাঁচ ছয় জন লোক নেমে মাইক্রোর গেট খোলা রেখে গেটের সামনে দু'ভাগ হয়ে দাঁড়াল।

তারিক বুঝল মাইক্রোতে কাউকে এনে উঠানোর জন্য তারা অপেক্ষা করছে।

'তাহলে কি শাহ বানুদের আবার..................।' এতটুকু চিন্তা আসতেই আঁৎকে উঠল সে।

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলে নেমে প্রাণপণে ছুটল আহমদ মুসার দিকে। ছুটার সাথে সাথে সে 'স্যার', 'স্যার' বলে চিৎকার করছে।

আহমদ মুসার কানে পৌঁছেছে তারিকের ডাক। দ্রুত সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ডান শোনার সাধে সাথে তার মনে শংকা জেগেছে।

আহমদ মুসা দেখল তাকে ঘুরতে দেখে তারিক হাত দিয়ে ইঙ্গিত করছে পুরাতত্ত্ব অফিসের সামনের দিকে।

ইঙ্গিত দেখেই ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। তাহলে কি শাহ বানুদের কোথাও সরিয়ে নিচ্ছে! তারিকের পাগলের মত ছুটা ও চিৎকারের এটাই তো অর্থ হতে পারে।

এবার ছুটল আহমদ মুসা তাদের গাড়ির কাছে ফিরে আসার জন্যে।

তারিক থমকে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা তার কাছাকাছি আসতেই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'স্যার, পুরাতত্ত্ব অফিসের সামনে মাইক্রো। কাউকে গাড়িতে তোলার আয়োজন করছে।'

আহমদ মুসা কিছু না বলে তার ছুটা অব্যাহত রাখল।

গাছের তলা পর্যন্ত আসতেই আহমদ মুসা দেখতে পেলো, কয়েকজন কাউকে টেনে-হেঁচড়ে গাড়িতে তুলছে। পাশে ওদেরই আরও লোক দাঁড়িয়ে থাকায় পরিষ্কার দেখা গেলনা, কিন্তু কাপড়-চোপড়ের যে অংশ বিশেষভাবে দেখা গেল তাতে একাধিক মহিলাকে গাড়িতে উঠানো হচ্ছে তা নিশ্চিত।

আহমদ মুসা ছুটে এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। তারিক এসে বসল পাশে। মাইক্রো তখন স্টার্ট নিয়ে ফেলেছে।

এদিকেই মাইক্রোটি গড়াতে শুরু করেছে। তার মানে মাইক্রোটি দক্ষিণে কোথাও যাবে।

খুশি হলো আহমদ মুসা মাইক্রোটিকে এদিকে আসতে দেখে। সিদ্ধান্ত সে নিয়ে নিয়েছে, এখানেই সে আটকাবে মাইক্রোটিকে।

মাইক্রোটি আসছে।

রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত।

আহমদ মুসা রাস্তার পশ্চিম পাশে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাইক্রোটি আসছে রাস্তার পূর্ব পাশ দিয়ে। মাইক্রোটি আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে এলে দু'গাড়ির মধ্যকার দূরত্ব দাঁড়াবে বিশ গজের মত।

পরিকল্পনা করে ফেলল আহমদ মুসা।

দু'হাতে দুটি রিভলবার তুলে নিল আহমদ মুসা। দু'তর্জনি দু'ট্রিগারে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

মাইক্রোটি এসে পড়েছে। মাইক্রোর ভেতরের অবয়বগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভারের পাশের জানালায় কাঁচ নামানো। সামনের সীটে আছে দু'জন, মাঝের সিটে তিনজন এবং পেছনের সিটে শাহ বানু ও সাহারা বানুকে নিয়ে ৪ জন।

মাইক্রোর দু'টি দরজাই পূব দিকে।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রিভলবার ধরা দু'হাত তার পেছনে।

মাইক্রোটি আহমদ মুসার গাড়ির সমান্তরালে এসে যাচ্ছে।

'তারিক তুমি গাড়িটা রাস্তার ওপাশে মাইক্রোর পেছনে নিয়ে আসবে।'

মুখের কথা শেষ হবার সাথে সাথেই রিভলবার ধরা তার দু'হাত উপরে উঠেছে। দু'রিভলবারের গুলি তার একসাথেই বেরিয়ে গেল। তার ডান হাতের রিভলবার গুলি করেছে মাইক্রোর সামনের ডান দিকের চাকায় আর বাম হাতের রিভলবারের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করেছে ড্রাইভারকে।

গুলীর রেজাল্ট না দেখেই আহমদ মুসা বাঘের মত দীর্ঘ এক লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে চরকির মত নিজের দেহটা মাটির উপর গড়িয়ে রাস্তার ওপাশে চলে গেল।

মাইক্রোতে ফুল স্পীড ছিলনা। গুলী খাওয়ার পর মাইক্রোটি প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে কাত হয়ে গিয়ে আবার এঁকে-বেঁকে একটু সামনে এগিয়ে ফুটপাতের সাথে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে থেমে গেল।

মাইক্রো থামলেও মাইক্রোর ভেতরের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল না। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ধাক্কায় নাকাল হওয়া, আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে পড়া

এবং শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্তি এসব কারণে তাদের বের হতে বিলম্ব হলো। অন্যদিকে আহমদ মুসা মাইক্রো দাঁড়াবার সাথে সাথেই গড়িয়ে গিয়ে মাইক্রোর পেছনে অবস্থান নিল।

মাইক্রো থেকে বের হতে ওরা দেরি করলেও হুড়মুড় করে ওরা অবার একসাথেই ৬ জন বেরিয়ে এল।

ওরা বেরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই আহমদ মুসা গাড়ির পেছনে বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যাতে ওদের সবাইকে চোখের সামনে আনা যায়।

আহমদ মুসাকেও ওরা দেখতে পেল।

আহমদ মুসার দু'হাতের রিভলবার তাক করা ছিল ওদের দিকে।

কিন্তু বেপরোয়া ওরা ওদের হাতের রিভলবার তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। দু'রিভলবার দিয়ে ছয়জনকে তাক করা যায়না, এ ধারণাই কাজ করেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু হাতের রিভলবার টার্গেট পর্যন্ত তোলা ও গুলী করার জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন তাতে দু'রিভলবার কেউ কেউ ছয়জন কেন তারও বেশি লক্ষ্যভেদ যে করতে পারে, সেটা তাদের বিবেচনায় আসেনি।

এর ফল তাদের ভোগ করতে হলো। আহমদ মুসার দু'রিভলবার পাখির মসতো শিকার করল ওদের ছয়জনকে।

ছয় গুলী শেষ করেই আহমদ মুসা তাকাল গাড়ির ভেতরে শাহ বানুদের অবস্থা দেখার জন্যে। দেখতে পেল শাহ বানু ও তার মা দু' জনেই আহমদ মুসার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। সাহারা বানুকে আহত দেখল আহমদ মুসা। তার কপাল সম্ভবত থেঁতলে গেছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর পরেও দু'জনেরই মুখ ভরা আনন্দ এবং চোখ উপচানো খুশির ঔজ্জ্বল্য।

আহমদ মুসা দ্রুত খোলা দরজার সামনে গিয়ে একটু নিচু হয়ে বলল, 'খালাম্মা তাড়াতাড়ি নেমে পড়ুন, শাহ বানু এস।'

আহমদ মুসা ধরে ওদের নামিয়ে আনল।

এ সময় তারিকও গাড়ি এনে মাইক্রোর পেছনে দাঁড় করাল।

গাড়ি দাঁড় করিয়েই গাঁড়ি থেকে নামল তারিক। খুলে দিল পেছনের দরজা।

আহমদ মুসা শা বানু ও সাহারা বানুকে ধরে গাড়ির দিকে আনছিল।

শাহ বানু ও সাহারা বানুর চোখে-মুখে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য ফিরে এলও তাদের শরীরের আতংকজনিত ভেঙে পড়া অবস্থা যায়নি। তারা দাঁড়াতে গিয়েও কাঁপছিল।

আহমদ মুসা ওদেরকে গাড়িতে বসিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তারিক তুমি রিভলবারগুলো কুড়িয়ে আন, কুইক।'

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল।

তারিকও রিভলবার কুড়িয়ে এনে আহমদ মুসার পাশের সিটে বসল।

এলাকাটি অফিস এলাকা হলেও এবং অফিসের সময়ের দেড় ঘণ্টা বাকি থাকলেও বেশ দূরত্বে দু'চারজন জমা হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা তাকাল পুরাতত্ব অফিসের দিকে। ওরা জানতে পেরেছে কিনা, দেখতে পেয়েছে কিনা- এটা একটা বড় বিষয়।

আহমদ মুসা দেখতে পেল অফিসের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরও দু'জন ভেতর থেকে ছুটে এল। তারপর চারজনেই ছুটল অফিসের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ানো জীপরে দিকে।

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। ওরা চারজন তাহলে জীপ নিয়ে তাকে ফলো করবে। ওদের মধ্যে শংকরাচার্য নেই। এখানে মৃত ছয়জনের মধ্যেও শংকরাচার্য নেই। সে তাহলে গেল কোথায়?

আহমদ মুসা আপাতত এ ভাবনা রেখে পায়ের পাশ থেকে একটা ব্যাগ তুলে পেছন দিকে এগিয়ে ধরে শাহ বানুদের উদ্দেশ্যে বলল, 'শাহ বানু ব্যাগে দেখ ফাস্ট এইডের জিনিস রয়েছে। খালাম্মার আহত জায়গাটায় ফাস্ট এইড লাগাও।'

'আমরা ভাল আছি বেটা। আমাদের কথা ভেবনা। নতুন জীবন পেয়েছি। কোন কষ্টই কষ্ট নয়।' বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসার গাড়ি লর্ড মেয়ো রোর্ড থেকে কালিকট রোডে পড়ল। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দক্ষিণে কালিকটের দিকে যাবার এটাই সবচেয়ে সোজা পথ। পোর্ট ব্লেয়ার ও কালিকটের মধ্যবর্তী সেই উপকূলই আহমদ মুসার টার্গেট।

কালিকট রোডে পড়ার পর আহমদ মুসা রিয়ারভিউতে দেখল, জীপটি ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। আহমদ মুসা গাড়ির গতি বাড়াল না।

শহর ছেড়ে পাহাড় এলাকায় প্রবেশ করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়িকে ফলো করে আসার জীপটাকে শাহ বানুরাও দেখতে পেয়েছে। তারা ঘন ঘন তাকাচ্ছে পেছন দিকে। তাদের মুখে-চোখে আবার ফুটে উঠেছে সেই আতংকের ভাব।

আহমদ মুসার গাড়ির স্পীড কমমে কমতে এক সময় 'ডেড স্টপ' হয়ে থেমে গেল।

আহমদ মুসা দু'টি রিভলবার হাতে নিয়ে বলল, 'শাহ বানু গোলাগুলী শুরু হয়ে গেলে তুমি খালা আম্মাকে নিয়ে সীটে শুয়ে পড়বে। তারিক তুমিও।'

আহমদ মুসা দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির সামনে চলে গেল। খুলল ইন্জিনের ঢাকনা।

'গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?' আর্তকণ্ঠে বলল সাহারা বানু।

কে উত্তর দেবে এই প্রশ্নের। শাহ বানুর চোখে-মুখেও নেমেছে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। তারিকও উদ্বেগ-আতংকে মুষড়ে পড়েছে। এই ভয়ানক সময়ে তাদের গাড়ি খারাপ হল, এই চিন্তা তার মনকে দারুণ পীড়া দিচ্ছে।

পেছনের জীপ দেখতে পেয়েছে সামনের গাড়ির এই দুর্দশার চিত্র। জীপের ড্রাইভিং সীটের লোকটি অন্যদের লক্ষ্য করে বলল, 'আমি ঐ গাড়ির পেছনে জীপ দাঁড় করাচ্ছি। আসল লোক গেছে সামনে গাড়ি ঠিক করতে। গাড়িতে মেয়ে দু'টি আর একটি ছেলে। আমরা চারজন একসাথে নামব দু'জন দু'পাশ থেকে পাহারা দেব গাড়ি ঠিককরারত লোকটাকে। সে যেন আক্রমণে আসতে না পারে। আর দু'জন গিয়ে ছেলেটিকে কাবু করে বা হত্যা করে মেয়ে দু'জনকে বের করে আনবে।

ওদিকে আহমদ মুসা গাড়ির সামনের ঢাকনাটা তুলে রেখে গাড়ির নিচে ঢুকে গেল। মাটি আঁকড়ে শুয়ে সাপের মতো গড়িয়ে গাড়ির পেছন দিকে এগুচ্ছিল।

গাড়িটা আহমদ মুসা এমন মজার জায়গায় দাঁড় করিয়েছে যেখানে গাড়ির তলার জায়গাটা নিচু, দু'ধার আবার উঁচু। কিছুটা নালা গোছের। গাড়ির দু'ধারের চাকা পড়েছে নালার দু'ধারের উঁচু প্রান্তে। গাড়ির তলার নালা দিয়ে এগুতে আহমদ মুসার তাই কোন কষ্ট হলোনা। তবে নালা মত জায়গাটায় কাদা-পানি থাকায় মুখসহ সামনের দিকটা কাদার প্লাস্টারে ঢেকে গেল আহমদ মুসার।

আহমদ মুসা যখন গাড়ির পেছনে পৌঁছে গেছে, তখনই জীপটি এসে দাঁড়াল আহমসদ মুসাদের গাড়ির চার পাঁচ গজ পেছনে। আহমদ মুসা জীপের উপরের অংশ ছাড়া দু'পাশ ও নিচের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আহমদ মুসা তার মুখ লম্বাভাবে মাটির উপর রেখে দু'হাতের দু'রিভলবার দিয়ে জীপের দু'পাশটাকে টার্গেট করল।

জীফ থামার সঙ্গে সঙ্গেই জীপের পাশ দিয়ে প্রায় একই সঙ্গে ৮টি পা নেমে এল। আহমদ মুসা ওদের নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছিল, দেহের উপরের অংশ নয়।

আটটি পা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ওরা জীপ পার হয়ে মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় সহজ টার্গেটে আসার পর আহমদ মুসা স্থির লক্ষ্যে গুলী করা শুরু করল। দু'রিভলবার হতে চারটি ফায়ার হতেই চারজন মাটিতে পড়ে গেল।

এবার ওদের চারজনকেই আহমদ মুসা দেখতে পেল। চারজনই পায়ে গুলী খেয়েছে। ওরা বসে পড়ে উদভ্রান্তের মত চারদিকে খুঁজতে লাগল গুলী কোন দিক থেকে এল। ওদের হাতে তখনও রিভলবার, চোখে হিংসার আগুণ।

আহমদ মুসা তার রিভলবারের নল দিয়ে গাড়ির গার্ডারে দুটি আঘাত করল। একটা ধাতব শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদের চারজনের চোখই ছুটে এল এদিকে।

ওরা দেখতে পেল আহমদ মুসার মুখ এবং দু'হাতের রিভলবার।

প্রথমটায় ওরা ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল। তার পরক্ষণেই ওদের চারজনেরই রিভলবার উঠতে লাগল আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

কিন্তু আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগার স্পর্শ করে তৈরি হয়েছিল। আহমদ মুসার দু'তর্জনি আবার দু'বার করে চাপল রিভলবারের ট্রিগার। বেরিয়ে গেল চারটি গুলী। নিঁখুতভাবে তা লক্ষ্যভেদ করল। চারটি দেহই এবার গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

গাড়ির পেছনে নালার মাথাটা ছিল তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। বের হতে কষ্ট হলো। কর্দমাক্ত ও ধুলি ধুসরিত দেহ নিয়ে আহমদ মুসা বেরিয়ে এল।

শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক সবাই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ওদের চারজনকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে এবং আহমদ মুসাকে আশে-পাশে না দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছে তারা। আহমদ মুসাতে দু'হাতে রিভলবার নিয়ে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা যেন প্রাণ ফিরে পেল। সাহারা বানু আহমদ মুসাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'বেটা তোমাকে না দেখে মনে হচ্ছিল গোটা জগৎ যেন মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন, শত মায়ের শত বোনের অশ্রু মোছাতে তোমাকে সামর্থ দান করুন। তোমার এত কষ্টের শতগুণ জাযা আল্লাহ তোমাকে দান করুন।'

'ধন্যবাদ খালাম্মা।' বলল আহমদ মুসা

তারপর দ্রুতকন্ঠে বলল, 'আসুন এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। আল্লাহর বিশেষ দয়া যে এতক্ষণ কোন গাড়ি এদিকে আসেনি।'

ইতোমধ্যে তারিক মৃত চারজনের রিভলবার ও মোবাইল সংগ্রহ করেছে।

আহমদ মুসা তারিকের পিঠ চাপড়ে বলল, 'এই তো যুদ্ধের ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছে। সাবাস!'

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করল।

'ভাইয়া, সামনের দিকের কাপড় শুধু ভিজা নয় একদম কাদায় লেপটে গেছে। আপনার ব্যোগে বাড়তি কাপড় দেখেছি....।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল শাহ বানু। কথা শেষ না করেই থেমে গেছে শাহ বানু।

'কিছু ভেব না শাহ বানু, আমার এ সবে অভ্যেস আছে।' হাঁটতে হাঁটতে বলল আহমদ মুসা।

সবাই গাড়িতে উঠল

আবার গাড়ি ছুটে চলল।

'স্যার, মাফ করবেন। একটা কথা। আপনি গাড়ির নিচে ঢুকবেন তো গাড়ির ঢাকনা তুললেন কেন? আমি তো ভয় পেয়েছিলাম, গাড়ি বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে।'

'ঢাকনা না তুললে তো ওরা গাড়ির সামনেটাও দেখতে পেতো। যদি দেখতে পেতো আমি নেই তাহলে ওরা সাবধান হয়ে যেত এবং আমাকে খোঁজার কাজটাই তারা প্রথমে করত। আমাকে গাড়ির তলায় ওরা খুঁজে পেতেও পারতো।'

'ঠিক স্যার।' বলল তারিক।

'তারিক তুমি আহমদ মুসাকে 'স্যার' বল? ভাই বল না?'

চমকে উঠল তারিক 'আহমদ মুসা'র নাম শুনে। দ্রুত পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'খালাম্মা ইনি আহমদ মুসা?' কন্ঠে তার রাজ্যের বিস্ময়।

'কেন তুমি 'আহমদ মুসা'কে চেননা? তোমার 'স্যার' আহমদ মুসা জাননা?' বলল সাহারা বানু।

তারিক ভূত দেখার মত শ্বাসরুদ্ধকর এক অনুভূতি নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়েই রইল। মনের ভেতরে তোলপাড়। এই আহমদ মুসা! সকাল থেকেই আহমদ মুসার পাশেই সে আছে! আহমদ মুসা হুকুম দিচ্ছে, ঐ হুকুম তামিল করার সৌভাগ্য সে লাভ করেছে! সেই বিরাট আহমদ মুসা এত সহজ, এত সরল, এত আপন! গর্বে বুক ভরে উঠল তারিকের। আহমদ মুসার জীবন-মৃত্যুর অপরূপ খেলার সে চাক্ষুস সাক্ষী হতে পেরেছে, তার সাথী হতে পেরেছে।

আনন্দ বিস্ময় আবেগ অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এল তার চোখ দিয়ে।

আহমদ মুসা ড্যাশবোর্ড থেকে একটা টিস্যু পেপার তুলে নিয়ে তারিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চোখের পানি মুছে ফেল তারিক। বলেছিনা যে, অশ্রু মানুষকে দুর্বল করে।'

'এটা ভয়ের নয়, আনন্দের অশ্রু স্যার। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বজনের আকস্মিক সাক্ষাতে যে অশ্রু ঝরে, তা মানুষকে দুর্বল নয় প্রাণবন্ত করে।' তারিক বলল।

'ধন্যবাদ তারিক। স্বজন পাওয়ার প্রতি আমার খুব লোভ।'

'কিন্তু আমাদের মত আপনার কোটি কোটি স্বজন প্রতিটি সকাল সন্ধ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছে স্যার।'

তারিকের কথা শেষ হতেই সাহারা বানু বলল, 'বৃটেন থেকে 'স্যার' সম্বোধনে দেখছি একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে গেছ তারিক।'

'খালাম্মা, তারিক আমার ছাত্র হতে চায়। এটা ভাল। আমি ওর ট্রেনিং শুরু করেছি। একজন বিরাট যোদ্ধা ওকে বানিয়ে ছাড়ব।'

'ভাইয়া, যোদ্ধা কাউকে বানানো যায়? যোদ্ধা হওয়া তো মননের ব্যাপার।' বলল শাহ বানু গম্ভীর কন্ঠে।

'তোমার কথা ঠিক শাহ বানু। এক শক্তিশালী মনন ওর মধ্যে আছে বলেই আমি ওকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল তারিকের চোখে-মুখে। সেই সাথে লজ্জাও। লজ্জাকর একটা ভাবনা এসে ঘিরে ধরেছে। শাহ বানুর প্রতি তার দুর্বলতার কথা, শাহ বানুর নেতিবাচক মনোভাবের কথা, ইত্যাদি বিষয় আহমদ মুসাকে বলা তার ঠিক হয়নি। এখন সে কি করবে! আহমদ মুসা ও শাহ বানুর উপস্হিতিতে পরিস্থিতি তার জন্যে যে মহাবিব্রতকর হয়ে উঠেছে।

কথাটা বলেই আহমদ মুসা তাকাল তারিকের দিকে। তার বিব্রত অবস্থা দেখতে পেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

'আমরা গন্তব্যে প্রায় এসে গেছি খালাম্মা। সামনেই উপকূল।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। একটু ভাবল। সেই সাথে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'খালাম্মা, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বেশ দূরে ভিন্ন একটা জায়গায় আপনাদের নিয়ে যেতে চাই।'

'কোথায় বেটা।' বলল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা।

'মায়া বন্দর ও পাহলগাঁও-এর মাঝখানে গভীর জংগলে সবুজ উপত্যকার এক আদিবাসীদের জনপদে।'

'ওখানে কে আছে?'

'আমার বড়বোন এবং আমার দুলাভাই।'

'তোমার ভাই-বোন কেউ নেই, বড় বোন কোথেকে এল?'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'পাতানো বড় বোন, তাঁকে বড় বোন ডেকেছি।'

'হঠাৎ কোথায় কিভাবে তাঁদের পেলে? মাত্র কয়েক দিন তো তুমি পোর্ট ব্লেয়ারের বাইরে ছিলে?'

'এই কয়েকদিনে অনেক ঘটনা ঘটেছে খালাম্মা।'

আহমদ মুসা কথা শেষ হবার সাথে সাথে গাড়ি- একটা ঝোপের পাশে দাঁড় করাল। বলল, খালাম্মা, এ ঝোপটা পার হলেই আমরা উপকূলের সামনে পড়ে যাব। এই উপকূলের ধারে তারিককে মেরে ফেলতে নিয়ে আসা লোকটি এখনও পড়ে থাকার কথা। সে আপনাদের দেখতে পাক, সেটা ঠিক হবেনা। আমি দেখে আসি। আপনার ঝোপের আড়ালে একটু দাঁড়ান।'

আহমদ মুসা গাড়ি নিতে গিয়েও নিলনা। ভাবল সে, আগে দেখা দরকার আহত লোকটি আছে। তারপর গাড়ি নেয়া যাবে।

এই ভাবনাকে আহমদ মুসা খুবই গুরুত্ব দিল। সরাসরি বাইরে না বেরিয়ে জংগলের আড়াল নিয়ে সে এগুলো সামনে।

এক সময় গোটা উপকূলইটাই তার নজরে এল। দেখল, 'সেই আহত লোকটি নেই।' বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল সকাল ৮টা চল্লিশ মিনিট বাজে।

নানা চিন্তা, নানা আশংকার বিষয় ঘুরপাক খেতে লাগল আহমদ মুসার মাথায়। যে গাড়িতে সকাল ৮টায় আমার কথা আত্মসমর্পণ করার জন্য, আমি না পৌঁছানোয় কি সে গাড়িটি উপকূলে এসেছিল খোঁজ নিতে? যদি তারা এসে থাকে, তারা পেয়ে গেছে আহত লোকটিকে। তার কাছে সব কথাই তারা শুনেছে এবং শুনেছে যে আমি সাড়ে ৮টায় ফিরে আসব।

এই চিন্তা তার যদি সত্য হয়, তাহলে এই উপকূলে কোথাও তারা ওঁৎপেতে অপক্ষো করছে আহমদ মুসার জন্যে। কোথায় তারা লুকাতে পারে? দু'পাশের কোন জংগলে নিশ্চয়।

যে কোন জংগলে তারা অপেক্ষা করতে পারে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। উত্তরেরও সন্ধান করতে লাগল।

আহমদ মুসা দক্ষিণ পাশের জংগল ধরে এগুচ্ছিল। পেছনে এই জংগলেরই একপাশে শাহ বানুদের সে লুকিয়ে রেখে এসেছে এবং এপাশের জংগলেই উপকূলে এক প্রান্তে এক ঝোপের ভেতরে বোটও লুকানো রয়েছে। আহমদ মুসা বোট থেকে নেমেছিল এ পাশের জংগলেরই কাছাকাছি জায়গায়। আবার তারিককে ডুবিয়ে মারার জন্যে তাকে পানিতে ফেলার জায়গাটাও দক্ষিণ পাশের জংগলেরই নিকটে। আর আহত লোকটিকে আহমদ মুসা যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেটাও এই জংগলেরই কাছে। সুতরাং শত্রুরা যদি তার জন্যে ওঁৎপেতে থাকে, সেটাও তাহলে এ দক্ষিণ পাশের জংগলেই হবে।

এই চিন্তা করার সাথে আহমদ মুসা ক্রলিং করে সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগুতে লাগল।

কিছুটা এগুবার পর আহমদ মুসা নাকে সিগারেটের গন্ধ পেল।

থেমে গেলে আহমদ মুসা।

সে উপরে গাছের দিকে তাকিয়ে পাতার নড়া-চড়া থেকে বুঝল বাতাস সামনে থেকে মানে পূর্ব দিক থেকে বইছে তাহলে ঠিকই যাচ্ছে আহমদ মুসা। সামনেই শত্রুদের সে পেয়ে যাবে।

ক্রলিং করে আরও মিনিট দুই এগুবার পর আহমদ মুসা চাপা কথার আওয়াজ পেল।

আরও এগুলো আহমদ মুসা।

চোখে পড়ে গেল ওরা আহমদ মুসার। জংগলের মধ্যে একটা গোলমত জায়গায় একটা তোয়ালে বিছিয়ে ৪ জন তাস খেলছে। আর দু'জন একটা গাছের আট দশ ফিট উঁচু ডালে উত্তরমুখী হয়ে বসে ফাঁকা উপকূলের দিকে নজর রেখেছে। গাছে বসা দু'জনেই সিগারেট খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কুকুরের আকাশ-ফাটা চিৎকারে চমকে উঠল আহমদ মুসা। দেখল সে, ওদের পাশে কুকুরটা শুয়ে ছিল, লাফ দিয়ে উঠল। উঠার আগেই সে চিৎকার দিতে শুরু করেছে। বোধ হয় কুকুরটি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। উঠেই সে পরিচিত গন্ধ পেয়েছে, যদি আহমদ মুসার কোন জিনিস কুকুরটিকে শুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে। অথবা অপরিচিত গন্ধ পেয়েও কুকুরটি ক্ষেপে উঠতে পারে। এসব ভাল আহমদ মুসা।

কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠার সাথে সাথে চারজনের তাস খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। তারা পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। জংগলের আড়ালে থাকার কারণে তারা আহমদ মুসাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ডালে বসা দু'জন লোক ঠিকই দেখতে পেয়েছে আহমদ মুসাকে। তাদের হাতেও উঠে এসেছে রিভলবার।

আহমদ মুসার দু'হাতে দু'রিভলবারের দুটি গুলি সে একই সাথে করেছে ডালে বসা দু'জনকে লক্ষ্য করে।

বুকে গুলি খেয়ে দু'জনেই ডাল থেকে খসে পড়ল মাটিতে।

ওদিকে ওরা কুকুরের চেন খুলে দিয়েছে।

ছুটতে শুরু করেছে কুকুর। ওরা চারজন কুকুরের পেছনে। তাদের হাতের রিভলবার বাগিয়ে ধরা। হিংস্র দৃষ্টি তাদের চোখে।

আহমদ মুসার রিভলবার ডালের দু'জনকে গুলি করেই লক্ষ্য নামিয়ে নিয়ে এসেছিল নিচে কুকুর এবং সেই চারজনের দিকে।

আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবার টার্গেট করেছে ছুটে আসা কুকুরটিকে। গোলাকৃতি সেই ফাঁকা জায়গা থেকে জংগলে ঢোকার বেশ আগেই মাথায় গুলী খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল কুকুরটি। আর ডান হাতের রিভলবার টার্গেট

করল চারজন লোককে। অধীকতর ক্ষীপ্র আহমদ মুসার ডান হাত তার সাথে বাম হাত যোগ দেবার আগেই অব্যর্থ গুলীতে তিনজনকে শিকার করা সমাপ্ত করল। বাম হাত এসে চতুর্থ জনকে গুলী করে ওদের আক্রমণে আসার চেষ্টার ইতি ঘটাল।

ঘটনার এ জায়গা থেকে উপকূলের ফাঁকা এলাকা দশ গজের বেশি দূরে নয়।

আহমদ মুসা জংগল থেকে বেরিয়ে এল। সে তাকাল শাহ বানুরা যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে সে ঝোপের দিকে। দেখল, ঝোপের আড়াল থেকে তারিক উঁকি দিচ্ছে। আহমদ মুসাকে দেখে সে ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে এল। আহমদ মুসা তাকে গাড়িসহ সবাইকে নিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করল।

দু'মিনিটের মধ্যেই তারিক সবাইকে নিয়ে হাজির হলো।

গাড়ি থামতেই শাহ বানু প্রথম নামল। বলল, ভাইয়া, আপনি ভাল আছেন তো। গুলীর আওয়াজ শুনলাম, কুকুরের আওয়াজ শুনলাম। ওদের.......।'

'ভাল আছি। গুলীর আওয়াজ ছিল আমার, কুকুরের আওয়াজ ছিল ওদের।' আহমদ মুসা বলল।

'ওরা কারা?' বলল সাহারা বানু।

অন্যেরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে এসেছিল।

'আসুন' বলে আহমদ মুসা সবাইকে জংগলের ভেতরে নিয়ে গেল। দেখাল ৬ জনের লাশ। বলল, 'এরা এখানে ওঁৎ পেতে বসে ছিল আমাদের অপেক্ষায়।'

'কিন্তু আমরা এখানে আসব তা ভাবল কি করে? প্রশ্ন করল শাহ বানু।

'যে আহত লোকটিকে রেখে গিয়েছিলাম, তাকে আমি বলে গিয়েছিলাম সাড়ে ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্যে। আমি ঠিক করেছিলাম, আমি ফিরে এলে সেই গাড়িতে সে যেতে পারবে। কারণ আমার গাড়ির আর দরকার হবে না।'

'তাকে যখন বাঁচাতে চাও, তখন যাবার সময় লিফট দিলে পারতে। গাড়ি পাওয়া যায় এমন কোথাও নামিয়ে দিতে।' বলল সাহারা বানু।

‘কিন্তু তাকে উদ্ধারের জন্যে আপনাদের ওখানে পৌঁছার আগেই সেখানে আমাদের খবর পৌঁছে দিত।

‘বুঝেছি। ধন্যবাদ বেটা।’

‘আহত লোকটি এই ছয়জনের মধ্যে আছে?’ বলল তারিক।

‘নেই। আমরা এখানে পৌঁছার আগেই শংকরাচার্যের কোন গ্রুপ মনে হয় এখানে এসেছিল। হতে পারে এখান থেকে দু’মাইল পশ্চিমে গিয়ে যাদের কাছে আমার আত্মসমপর্ণের কথা ছিল, তারাই এখানে এসেছিল। আহত লোকের কাছে সব শুনে গাড়িতে করে আহতকে পাঠিয়ে দিয়ে অন্যেরা আমাদের ধরার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল এবং আমার মনে হয়, এরাই শংকরাচার্যকে জানিয়েছিল যে, আত্মসমপর্ণের বদলে আমি শাহ বানুদের উদ্ধার করতে গেছি। এই খবর পেয়েই শংকরাচার্য শাহ বানুদেরকে লর্ড মেয়ো রোডের ঐ বাড়ি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছিল।

‘তাই হবে ভাইয়া, আমাদের ঘরের বাইরে একজন আরেকজনকে বলছিল, ‘শয়তান ধরা দেয়নি। আর এ কুকুরকেও উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এখানে আর বন্দীদের রাখা যাবে না। মহগুরুচী বলেছেন, ‘ওখানে গিয়েই বাঘের শিকার ধরার মহোৎসব হবে। মহাগুরু গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানেই যাচ্ছেন।’

‘তোমরা কি জান বাঘের শিকার ধরার মহোৎসবটা কি?’

মুখটা ম্লান হয়ে উঠল শাহ বানুর। আতংক দেখা দিল তা চোখে-মুখে। মাথা নিচু করল সে। বলল, ‘জানি ভাইয়া, গত রাতেই শংকরাচার্য স্বয়ং এই হুমকি দিয়ে গেছে। আমার সারারাত আল্লাহকে ডেকেছি। আমাদের ছিল উভয় সংকট। আমাদের পরিণতির বিষয়টা যেমন ছিল অকল্পনীয়, আপনি আত্মসমর্পণ করলে আমরা, আপনি একসাথে বিপদগ্রস্থ হতাম।’

‘আমিও এটা জানতাম শাহ বানু।’

‘তাহলে আত্মসমপর্ণে রাজি হলেন কেন?’ জিজ্ঞাসা শাহ বানুর।

‘দু’কারণে রাজি হয়েছি। এক, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতিকে বিলম্বিত করা, দুই, তোমাদের উদ্ধারের একটা সুযোগ তৈরি করা। আল্লাহ সে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।’

‘আল হামদুলিল্লাহ।’ একসাথে বলে উঠল শাহ বানু, সাহারা বানু দু’জনেই।

একটা নিরবতা।

নিরবতা ভাঙল তারিক। বলল, ‘আমার একটা কৌতুহল স্যার, জংগলে এদের আপনি পেলেন কি করে? আমাদের পাহারায় থেকেও এরা গুলী ছুড়তে পারলোনা কেন?’

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তুমি যখন আমার ছাত্র, তখন তো শেখাতেই হবে। শোন, যখন দেখলাম আহত লোকটি উপকূলে নেই, তখন বুঝলাম কেউ বা কারা এসেছিল। যখন শত্রুপক্ষের লোক এসেছিল, তখণ তারা অবশ্যই জেনেছে আমি এখানে ফিরে আসব। যখন তারা জেনেছে আমি ফিরে আসব, তখন অবশ্যই আমার জন্যে তারা ফাঁদ পাতবে। তারপর চিন্তা করেছি, দু’পাশের জংগলের কোন পাশে তারা অপেক্ষা করবে। সকল বিচারে আমি দেখলাম, দক্ষিণ পাশের জংগলে তাদের লুকিয়ে থাকা স্বাভাবিক। আমি দক্ষিণের জংগল ধরে অগ্রসর হলাম। এক জায়গায় পৌঁছে সিগারেটের গন্ধ পেলাম। বাতাসের গতি দেখে বুঝলাম, পূর্ব দিক থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। আমি ওদের সন্ধানে অগ্রসর হলাম এবং ওদের পেয়েও গেলাম। ওদের কুকুর আমাকে টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদের দু’জন গাছের ডালে বসেছিল পাহারার জন্যে। তারা আমাকে দেখতে পেল এবং গুলী করতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি গুলী করলাম। এভাবেই ঘটনার ইতি হলো।’

‘ধন্যবাদ স্যার, এই কয়েক ঘন্টায় স্যার আমি অনেক কিছু শিখে ফেলেছি।’ বলল তারিক।

‘এই তো উপযুক্ত ছাত্রের কাজ। এবার তুমি ছয়জনের মোবাইল ও রিভলবারগুলো এবং শা বানুদের নিয়ে বাইরে যাও। সামনের এক ঝোপে স্পীড বোট লুকিয়ে রেখেছি। ওটা নিয়ে আমি আসছি।’

বলে আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটা শুরু করল পূর্বদিকে। ঝোপের আড়াল থেকে স্পীড বোট চালিয়ে পানিতে নেমে গেল।

শাহ বানুরাও তীরে এসে পড়েছে। বোটে উঠল সবাই।

‘স্যার, আমি বোট ভাল ড্রাইভ করতে পারি।’ বলল তারিক মুসা মোপলা।

‘কিন্তু রুট তো নতুন তোমার জন্যে।’ আহমদ মুসা বল।

‘অসুবিধা হবে না স্যার, আপনি তো পাশে থাকছেন।’

‘বেশ এস। তোমার উপর শিক্ষকতা করার আরও একটা সুযোগ পাওয়া গেল।’

বলে আহমদ মুসা সরে এল ড্রাইভিং সিট থেকে।

‘ধন্যবাদ স্যার’ বলে তারিক গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে। বসে বলল, ‘স্যার আপনার কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তেই শেখার আছে। আমার একটা গর্ব ছিল আমি গাড়ি ভাল ড্রাইভ করি, কিন্তু স্যার আপনার গাড়ি ড্রাইভ দেখে আমার মনে হয়েছে আমার বহু কিছু শেখার আছে।’

‘ধন্যবাদ তারিক। কি শিখতে হবে জানাটা কিন্তু একটা বড় শিক্ষা।’ বলে আহমদ মুসা বোটের ড্যাশবোর্ড থেকে একটা মানচিত্র বের করে আনল। সেটা তারিকের সামনে মেলে ধরে বলল, ‘দেখ রুটটাকে রেড মার্ক করে রেখেছি। এখন তুমি আন্দামানের পূর্ব উপকূল ধরে উত্তরে ১২ ডিগ্রী পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে এগিয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছার পর ডানে থাকবে হ্যাভলক আইল্যান্ড আর বামে দেখবে মেইণল্যান্ডের সাথে কীড দ্বীপপুন্জ। এ দ্বীপপুন্জের উত্তর মাথা দিয়ে একটা চ্যানেল ঢুকে গেছে মেইন্যোন্ড। এ চ্যানেলটি পশ্চিম উপকূলে স্পাইক বে’তে গিয়ে পড়েছে। স্পাইক বে’ থেকে বের হয়ে তোমাকে আন্দামানের পশ্চিম উপকূল ধরে এগোতে হবে। উত্তরে অ্যান্ডারসন দ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে অ্যান্ডারসন চ্যানেল দিয়ে এর মাথা পর্যন্ত পৌঁছে পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে কয়েক মাইল গেলেই গ্রীণ ভ্যালির উপকূল পাওয়া যাবে।’

থামল আহমদ মুসা।

তারিক মানচিত্রটি হাতে নিয়ে তার সামনে ড্যাশবোর্ডের উপর আবার রাখল।

চলতে শুরু করল বোট।

সাত সীটের বোটটি খুব সুন্দর।

ড্রাইভিং সীটের পেছনে ৬টি সীট বৃত্তাকারে সাজানো। মাঝখানে একটা নীচু গোলাকার টেবিল। চেয়ার ও টেবিল সবই ক্লোজ করে মেঝেতে ফেলে রাখা যায়। তখন বোটটি কার্গো বোট হয়ে দাঁড়ায়। আবার চেয়ার-টেবিল আনফোল্ড করলেই সুন্দর ট্যুরিস্ট বোট হয়ে দাঁড়ায়।

বোটের ইঞ্জিনে ডবল সাইলেন্সার লাগানো। কোন শব্দই হয়না। নিঃশব্দে তীরের মত এগিয়ে চলে বোটটি।

আহমদ মুসার কথা শেষ করার পর একটা নিরবতা নেমেছিল।

নিরবতা ভাঙল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা। বলল আহমদ মুসাকে উদ্দেশ্য করে, 'বেটা আমাদের দূর্ভাগ্যের খবর তুমি কিভাবে পেয়েছিলে? কখন পেয়েছিলে?'

'গতকাল বিকেলে আমি সুষমা রাও- এর কাছে টেলিফোন করেছিলাম। আমার টেলিফোন পেয়েই সে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে আপনারা কিডন্যাপড হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি বুঝতে পারি যে কারা এই কাজ করেছে। গতকাল বিকেলেই আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে গ্রীনভ্যালিতে। আপনাদের যারা কিডন্যাপ করেছিল, তাদেরই বার জন লোক পর্যটকের ছদ্মবেশে গিয়েছিল গ্রীনভালিতে আমার খোঁজে আমাকে ধরে আনার জন্যে। তাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। তারা সবাই মারা যায়। তাদেরই একজনের মোবাইল থেকে শংকরাচার্যের টেলিফোন নাম্বার পাই। সন্ধ্যার পরে এই তাকে টেলিফোন করে আপনাদের বিষয়ে জানার জন্যে। সেই কথা বলার সময় হুমকি দেয় আজ সকাল ৮টার মধ্যে আমি তাদের হাতে আত্মসমর্পল না করলে সে আপনাদের ক্ষতি করবে। তাই রাতেই চলে এলাম, যাতে সকাল আটটার মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়।'

'কিভাবে এলে? এই বোট নিয়ে?' বলল সাহারা বানু।

'ওঁরা খুব ভালো লোক। আমি শংকরাচার্যের হাতে আটকা পড়লে বোট ওরা কোনদিনই আর ফিরে পাবেনা জেনেও অত্যন্ত মূল্যবান বোটটি আমাকে দিয়েছে যাতে ঠিক সময়ে আমি পৌঁছতে পারি এখানে।' আহমদ মুসা বলল।

'ওঁদের কথা কিছুই শোনা হয়নি। কিন্তু তার আগে বল আমাদের রেখে চলে যাবার পর হঠাৎ তুমি নিরব হয়ে গেলে কেন? না এলে, না টেলিফোনেও

কোন যোগাযোগ করলে। মাত্র গতকাল সুষমার সাথে তোমার যোগেোযগ হলো কেন?’ বলল সাহারা বানু।

‘মাঝখানে শংকরাচার্যদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম, তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। যখন........।’

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারল না। আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই শাহ বানু বলে উঠল, ‘বন্দী হয়েছিলেন? শংকরাচার্যদের হাতে?’ শাহ বানুর কণ্ঠে উদ্বেগ।

আহমদ মুসার উত্তর দেয়ার আগেই কথা বলল সাহারা বানু। বলল, ‘কি অসুখ হয়েছিল তোমার? নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটেছিল!’ সাহারা বানুর কণ্ঠেও উদ্বেগ।

‘হ্যাঁ, খালাম্মা আহত হয়েছিলাম। আমি যাচ্ছিলাম ‘রস’ দ্বীপে আহমদ শাহ আলমগীরের খোঁজে। সাগর থেকেই ওরা আমাকে বন্দী করে হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়ে। ওদের বন্দীশালা থেকে পালাতে গিয়ে কাঁধে গুলী খেয়েছিলাম। ওরা আমার পিছু লেগেছিল গাড়ি ও হেলিকপ্টার নিয়ে। অনেকদূর পাহাড়ী এলাকায় যাবার পর ওরা আমাকে আগে ও পেছনে গাড়ি ও উপর থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জংগলে নামা ছাড়া উপায়ই ছিলনা। ঘন জংগলে অবিরাম খোঁজার কষ্ট এড়াবার জন্যে ওরা সংজ্ঞালোপকারী গ্যান বোমা ছোড়ে জংগলে। তখন আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম।’ আহমদ মুসা থামল একটু।

কিন্তু থামতেই উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল শা বানু, ‘আপনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন? আবার ধরা পড়লেন আপনি?’

‘না। আমাকে ওরা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধরে এনেছিল বটে, কিন্তু ধরে নিয়ে যেতে পারেনি। তোমাদের তার নাম বলেছি। আমি যাকে বড় বোন বলেছি সেই ডাক্তার সুস্মিতা বালাজীর স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ রাও আমাকে সেখান থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন। পরে আমি তাদের কাছে শুনেছিলাম, ড্যানিশ দেবানন্দ কোন কাজে ঐ এলাকার পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তিনি এক জায়গায় বসে- ওদের আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা, আমার জংগলে পালানো,

ওদের সংজ্ঞালোপকারী গ্যাসবোমা ছোড়া, আমার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়া, ওদের আমাকে গিয়ে ধরে নিয়ে আসা সবই চোখে দুরবীন লাগিয়ে দেখেছিলেন। তারপর তিনি পাহাড় থেকে নেমে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ডাক্তার সুস্মিতা বালাজী আমার গুলীবিদ্ধ স্থানে অপারেশন করেন। আমাকে কয়েকদিন ওরা নড়া-চড়া করতে দেননি। সুষমা রাওয়ের মোবাইলে তার কোন সাড়া পাচ্ছিলাম না। শেষে দ্বিতীয় আরেকটি মোবাইলের নাম্বার মনে পড়ে যায়। সেটায় গতকাল বিকেলে তাকে ফোন করে পেয়ে যাই। তার পরের ঘটনা সবকিছু বলেছি।'

'তোমার এত বিপদ গেছে? আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলেছেন। তোমার বোন মেয়েটা সত্যিই ডাক্তার?' বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

'জি, তিনি এমবিবিএস ডাক্তার।'

'গ্রীন ভ্যালি কি আসলেই জংগল?' শাহ বানু বলল।

'হ্যাঁ, একেবারে পুরোপুরি জংগল।'

'কিন্তু জংগলে থাকেন কেন ওরা?' শাহ বানুই প্রশ্ন করল।

'সে অনেক কাহিনী। দু'জনেই খুব বড় ঘরের ছেলে মেয়ে। বোন সুস্মিতা বালাজী ডাক্তার এবং তার স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একজন বিপুল বিত্তশালী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের মালিকের ছেলে। নিজেও চাকরি করতেন পোর্ট ব্লেয়ার সরকারের অধীনে। সৎ অফিসার ছিলেন। তার সততাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। ঐ শংকরাচার্যরা তার চরম বৈরী হয়ে দাঁড়ায়। একদিন একসাথে তারা ড্যানিশ দেবানন্দের পিতা-মাতাকে খুন করে। কৌশলে খুনের দায় চাপিয়ে দেয় ড্যানিশ দেবানন্দ ও সুস্মিতা বালাজীর উপর। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দেবানন্দ তার পিতার সহায়-সম্পদ শংকরাচার্যদের হাতে তুলে দিয়ে জংগলে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে আজ বিশ বছর ওঁরা জংগলে। আরেকটা বড় সুখবর তোমাদের জন্যে সেটা হলো সুস্মিতা বালাজী, মানে আমার পাতানো বড় বোন, তোমাদের সুষমা রাওয়ের ফুফাতো বোন। তারা মহারাষ্ট্রের একই গোষ্ঠীর মেয়ে।' আহমদ মুসা বলল।

‘কি বলছেন ভাইয়া, এটা সত্যি?’ বলল শাহ বানু। তার চোখে আনন্দ ও বিস্ময়।

‘সত্যি, তবে সুস্মিতা বালাজীর কথা সুষমা রাওয়ের মনে আছে কিনা জানি না। কিন্তু তার মা সুস্মিতা বালাজীকে খুব ভালবাসতেন, এখনও ভালবাসেন নিশ্চয়ই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝতে পারলাম না। মামাতো-ফুফাতো অচেনা হবে কিভাবে?’ বলল সাহারা বানু।

‘এর পেছনে কাহিনী আছে। সুস্মিতা বালাজী সুষমা রাওদের বোম্বের বাসায় থেকে মেডিকেল কলেজে পড়তো। সুষমা রাও বয়স যখন এক বছর, তখন সুস্মিতা বালাজী মেডিকেল কলেঝে শেষ বর্ষে পড়াকালে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ বর্ষের ছাত্র ড্যানিশ দেবানন্দকে পরিবারের বাধা সত্ত্বেও বিয়ে করে। বনিয়াদী ব্রাক্ষ্মণ পরিবারের মেয়ে ভিন্ন জাতের ছেলেকে বিয়ে করায় পরিবার তা সাথে সম্পর্ক ছেদ করে। আজ বিশ বছর হলো তার পরিবারের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ কিংবা সম্পর্ক নেই সুস্মিতা বালাজীর। সুষমা রাও তাকে চিনবে কি করে!’

‘ড্যানিশ দেবানন্দ কেমন ভিন্ন জাতের ছেলে? তারও তো হিন্দু নাম দেখছি!’ বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।

‘সুস্মিতা বালাজীকে বিয়ে করার সময় ড্যানিশ দেবানন্দ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পিতার দিক থেকে সে পার্সি এবং মায়ের দিক থেকে থাই বৌদ্ধ। দেবানন্দের মা থাইল্যান্ডের প্রথম রাজবংশের মেয়ে এবং তারা মূলত চীনা।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তোমার কাছ থেকে এই কাহিনীটা না শুনলেই ভাল ছিল। এখন খুব খারাপ লাগছে। তারা পরিবার হারিয়ে, স্বাধীন জীবন হারিয়ে জংগলে বাস করছে। কি দূর্ভাগ্য!’ বলল শাহ বানুর মা।

‘না খালাম্মা। ভাববেনা না। ওরা খুব ভাল আছে। আদিবাসীদের নিয়ে তারা এক নতুন জীবন শুধু নয়, এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। এই সাম্রাজ্যে তারা সম্রাট। পরিবার-পরিজনদের হারিয়ে পরিবারের চেয়ে অনেক বড় আদিবাসী এক সমাজকে তারা পেয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠেছে। কথা শেষ করেই আহমদ মুসা পকেট থেকে মোবাইল তুলে নিল।

সুষমা রাওয়ের টেলিফোন।

'হ্যালো। ওয়ালাইকুম ছালাম। বল সুষমা।' বলল আহমদ মুসা।

ওপারের কথা শুনে আবার বলল, 'না সুখবর আছে সুষমা। ওদের উদ্ধার করেছি। আমি এখন ওদের নিয়ে যাচ্ছি গ্রীণভ্যালিতে, যেখানে আমি, গত কয়েকদিন ছিলাম।'

'না সুষমা। ওরা ওখানে ভাল ও নিরাপদ থাকবে।'

না, ওরা অজানা-অচেনা কেউ নয়। তোমার খুব আপনজন ওরা।'

'না সত্যি বলছি।'

'ঠিক আছে বলছি। আগে তুমি খালাম্মা ও শাহ বানুর সাথে কথা বলে নাও।'

আহমদ মুসা মোবাইল দিল সাহারা বানুকে। সাহারা বানু কথা বলল। তার কাছ থেকে মোবাইল গেল শাহ বানুর কাছে। ওদের কথা আর শেষ হয়না।

শাহ বানুই অবশেষে বলে ফেলল সুস্মিতা বালাজীর পরিচয়। বোধ হয় শাহ বানুর কাছে শুনে সুষমার যেন সব শোনা হলো না। আহমদ মুসার সাথে কথা বলতে চাইল সুষমা রাও।

শাহ বানু আহমদ মুসাকে মোবাইল দিয়ে বলল, ভাইয়া, ওদের ব্যাপারে সুষমা আপনার সাথে কথা বলতে চায়।

আহমদ মুসা মোবাইল নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে সুষমা রাও বলল, 'কি ভাইয়া, শাহ বানু যা বলল তা সত্যি? সে সত্যিই আমার হারানো বোন?' গম্ভীর ও আবেগ জড়িত কন্ঠ সুষমার।

'তার কথা তোমার মনে আছে?'

'তাকে আমার মনে নেই। কিন্তু আম্মার কাছ থেকে তার কথা এত বেশি শুনি যে, তিনি আমার কাছে শত বছরের চেনার চেয়েও বেশি। আমার জন্মের পর তিনি এক বছর আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আম্মা বলেন, তিনি এই এক বছরে আমাকে শত বছরের আদর দিয়ে গেছেন। এক বছর আমি ওর কোলেই মানুষ

হয়েছি। আমার অসুখ-বিসুখ কিংবা কোন অসুবিধা হলে তিনি মেডিকেল কলেজেরে ক্লাসে যেতেন না।' বল্ল সুষমা রাও। কান্নাজড়িত কন্ঠ সুষমার।

'হ্যাঁ, সুস্মিতা। তিনি তোমাদের কথা খুব ফিল করেন। সেদিন তোমাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি অনেক কেঁদেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

'তার কথা আমার আম্মা শুনলে পাগল হয়ে যাবেন ভাইয়া। আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যমে কত যে সন্ধান করেন তিনি আপার। ভাইয়া, শাহ বানুদের নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকেও আপার কাছে নিয়ে চলুন।' বলল সুষমা রাও।

'তোমার আব্বার চোখ এড়িয়ে তোমার যাওয়া কঠিন। আমি কথা দিচ্ছি সুষমা, আপাকেই তোমাদের কাছে আনব।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ ভাইয়। আমি, আমার মা সীমাহীন খুশী হবো। আপনি আপার টেলিফোন নাম্বার দিন। এখনি টেলিফোন করব।'

আহমদ মুসা সুস্মিতা বালাজীর টেলিফোন নাম্বার দিল সুষমা রাওকে।

'ধন্যবাদ ভাইয়া, আমার সব ধন্যবাদ, সব কৃতজ্ঞতা আপনার জন্যে ভাইয়া। আবেগ রুদ্ধ কন্ঠে বলল সুষমা রাও।

'কথা ফেরত নাও সুষমা। মানুষের সব ধন্যবাদ, সব কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।'

'স্যরি। একজন নব্য মুসলমানের ভুল হতেই পারে। আমি আমার উক্তিটি প্রত্যাহার করলাম। কিন্তু ভাইয়া, আল্লাহ তো আল্লাহই। তিনি সর্বোপরি এবং সর্বশক্তিমান। সবকিছুর নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রক তিনি। আমি যে কথাটা বললাম তা বললে কি তার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়, না আরও কিছু কারণ আছে?'

'হস্তক্ষেপ অবশ্যই হয়। সব প্রশংসা, সব ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য মানুষ নয়, কারণ সব ক্ষমতা মানুষের নেই। যে কাজগুলোর জন্যে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিলে বা কৃতজ্ঞতা জানালে, সে কাজগুলো আমি করেছি বটে, কিন্তু এর কৃতজ্ঞতা কি আমার? একটা পুতুল ভাল নাচে, একটা কলম ভাল লিখে, এই 'ভাল নাচ' ও 'ভাল লেখা'র কুতিত্ব কি পুতুল ও কলমের? তা নয়। সবাই চোখ বন্ধ করে এই কৃতিত্ব দেবে পুতুল কলমের নির্মাতাকে। কারণ নির্মাতাই পুতুল ও কলমকে এই ভাল কাজের জন্যে তৈরি করেছে। সুতরাং আমি যে ভাল

কাজগুলো করেছি, তার যোগ্যতা, তার মানসিকতা, তার সুযোগ, সামর্থ্য সবই আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছি বিধায় প্রশংসা, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে।

'আপনি ঠিক বলেছেন ভাইয়া। কিন্তু একটা সমস্যা। মানুষের ভাল কাজের প্রশংসা আল্লাহকে দিতে হয়, তাহলে মানুষের মন্দ কাজের দায় আল্লাহর উপরই বর্তায়।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'পুতুল ও কলমের সাথে মানুষের পার্থক্য আছে। পুতুল ও কলমের স্রষ্টা পুতুল ও কলমকে নির্দিষ্ট একটা কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছে, অন্য কোন কাজ করার ক্ষমতা, স্বাধীনতা পুতুল ও কলমকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ চিন্তা ও কাজ করার স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই সাথে মানুষের মঙ্গলের জন্যে, মানুষের এই বিশ্বের শান্তি ও স্বস্তির জন্যে ভাল ও ভাল পথকে আল্লাহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন যুগে যুগে পাঠানো তাঁর নবী-রাসুলদের মাধ্যমে এবং বিধান দিয়েছেন মানুষকে ভাল কাজ হরতে হবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই বিধান মানুষ মান্যও করতে পারে, লংঘনও করতে পারে। ভাল কাজ করতে পারলে আল্লাহর প্রশংসা এই জন্যেই করতে হয় যে, ভাল কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য যেমন আল্লাহ দিয়েছেন, তেমনি ভাল পথ ও কাজ চেনার সুযোগও আল্লাহই করে দিয়েছেন। অন্যদিকে মানুষ মন্দ কাজ করে, মন্দ পথে চলে তখন আল্লাহর বিধান সে লংঘন করেই করে এবং কাজ করার যে শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ দিয়েছেন তার অপব্যবহার করে। সুতরাং কেউ মন্দ কাজ করলে ও মন্দ পথে চললে তার দায় দাকেই বহন করতে হবে, আল্লাহকে নয়।'

আহমদ মুসা থামল। থেমেই আবার বলল সুষমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে, 'এসব ভারী কথা এখন থাক, সাক্ষাতে হবে। এখন বল, তেমন কোন খবর আছে কিনা। তোমার আব্বা কি ভাবছেন শাহ বানুদের ও আহমদ শাহ আলমগীরের উদ্ধারের ব্যাপার নিয়ে?'

'কিছুই ভাবছেন না ভাইয়া, এসব ব্যাপারে নিজের থেকে কিছুই বলেননি তিনি। মিনিট পাঁচেক আগে তার রুমের পাশ দিয়ে আসার সময় টেলিফোনে খুব উত্তেজিতভাবে কথা বলতে শুনলাম। তিনি কাউকে গালিগালাজ করে বলছেন,

'সব অপদার্থের দল। একা একজন সব ওলট-পালট করে দিল। আর সকলে মিলে তোমরা ঘোড়ার ঘাস কাটলে।' তারপর তিনি কাউকে নির্দেশ দিলেন, 'ওদের নিয়ে অবশ্যই কোথাও তাকে উঠতে হবে, পোর্ট ব্লেয়ার বা অন্য কোথাও। বোটে তারা অন্য কোন দ্বীপেও যেতে পারে। সন্দেহজনক সকল স্থানে তোমরা অভিযান চালাও। আমি বলে দিয়েছি পুলিশ তোমাদের সাহায্য করবে।'

থামল সুষমা রাও।

'খুব মূল্যবান খবর দিলে তুমি সুষমা। আমার অনুমান মিথ্যা না হলে, আমাদের ব্যাপারেই ঐ নির্দেশ তিনি কাউকে দিয়েছেন।

'আমার মনও এরকম কিছু বলছে ভাইয়া। তার মানে আব্বা কি.........।'

কথা শেষ না করেই থেমে গলে সুষমা রাও।

'সুষমা প্রমাণহীন কোন সন্দেহ নিয়ে অযথা মন খারাপ করোনা।'

'কিন্তু ভাইয়া, আমার মনে সন্দেহ ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে যে, আমার কাছ থেকে আহমদ শাহ আলমগীরকে আলাদা করার জন্যেই তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।' শেষের কথাগুলো তার কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

'ধৈর্য্য ধর সুষমা। আহমদ শাহ আলমগীর সম্পর্কে সুখবর আমি শীঘ্রই তোমাকে দিতে পারব।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া। আল্লাহ আপনাকে সাহয্য করুন। আপনার সাথে সাক্ষাৎ না হলে অবস্থা আমাকে পাগল করে ফেলতো। আল্লাহর পরেই আপনার উপর আমার ভরসা।'

'ধন্যবাদ বোন। এখন কথা শেষ করি।'

'আব্বার ঐ নির্দেশ নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? আপনাদের অনেক সাবধান হতে হবে। আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। আপনি সময় না পেলে শাহ বানু যেন আমার সাথে যোগাযোগ রাখে।'

'আমি ঐ বিষয়ে সিরিয়াসলি ভাবা শুরু করে দিয়েছি। তুমি চিন্তা করোনা। তোমার কথা আমি শাহ বানুকে বলব। রাখছি। আসসালামু আলাইকুম।'

'ওয়াআলাইকুম আস সালাম।' ওপার থেকে বলল সুষমা রাও।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই উদ্বিগ্ন কন্ঠে বলল সাহারা বানু, 'সুষমা রাও কি খবর দিল বেটা?'

'আমাকে কি বলার জন্যে বলল সুষমা?' মা সাহারা বানু থামতেই বলল শাহ বানু।

'সুষমা তোমাকে ঘন ঘন টেলিফোন করতে বলেছে। আর খালাম্মা, সুষমার খবরটা হলো, ওরা আমাদের খোঁজার জন্যে চারদিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' বলল আহমদ মুসা।

'আমাদের দূর্ভাগ্য। কিন্তু সুষমা এ বিষয়টা এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে?' বলল সাহারা বানু।

'ক'মিনিট আগে তার আব্বা কারও সাথে টেলিফোনে যে কথাগুলো বলেছিল, তার থেকেই সুষমা এটা বলেছে।' বলল আহমদ মুসা।

'এত তাড়াতাড়ি বিষয়টা তার আব্বাই বা জানল কি করে? এমন কথা তিনি বলবেনই বা কেন? বলল সাহারা বানু। তার কপাল কুঞ্চিত।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, 'খালাম্মা আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা খুব বড় খালাম্মা।'

'আমার ধারণা সত্য না হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে কি জান, আহমদ শাহ আলমগীরের হারিয়ে যাওয়ার পেছনে সুষমার আব্বার হাত থাকতে পারে। যে অন্যবর্ণে বিয়ে করায় ভাগ্নীকে ত্যাগ করতে পারে, সে লোক নিজের মেয়েকে ভিন্ন ধর্মের ছেলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ভিন্ন ধর্মের ছেলের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি এই ঘটনা সত্যিই হয়, তাহলে আমাদের কিডন্যাপের সাথে তিনি জড়িত থাকতে পারেন।' বলল সাহারা বানু।

'খালাম্মা, আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঘটতে পারা যুক্তির মধ্যেও আসে। কিন্তু আমি ভাবছি, তিনি আরও বড় কিছুর সাথে জড়িত।'

'সেটা কি?' সাহারা বানুর প্রশ্ন।

'একটা হিংস্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সাথে তিনি জড়িত। এই গোষ্ঠীর হাতেই এই পর্যন্ত আন্দামানের কয়েক ডজন মুসলিম যুবক প্রাণ দিয়েছে।'

আহমদ মুসার মুখের কথা শেষ না হতেই তার মোবাইল আবার বেজে উঠল।

মোবাইল আবার তুলে নিল আহমদ মুসা। সুস্মিতা বালাজীর টেলিফোন।

খুশী হলো আহমদ মুসা। তাকে টেলিফোন করা দরকার মনে করেছিল আহমদ মুসা।

'হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আপা।' বলল আহমদ মুসা।

'ওয়ালাইকুম সালাম, ছোট ভাই। আপনাদের ওয়েলকাম। শাহ বানুরা আসছে জেনে খুব খুব খুশী হয়েছি আমরা।'

'আমি আপনাকে টেলিফোন করব মনে করছি। আপনি জানলেন কি করে যে আমরা আসছি?'

'সুষমা টেলিফোন করেছিল। এটা ছিল আমার জন্যে এক ঐতিহাসিক আনন্দের ঘটনা। সেই এক বছরের দেখেছিলাম তাকে। দেখলাম সে সব জানে, সব শুনেছে। আপনার কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার পেয়েও আমি আমি তাকে টেলিফোন করিনি সে আমাকে চিনতে পারে কিনা এই চিন্তায়। কিন্তু তার সাথে কথা বলে মনে হলো আমরা যেন একদিনের জন্যেও আলাদা হইনি। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার জন্যে এই আনন্দ, এই মিলন সম্ভব হলো।'

'ওয়েলকাম আপা। আপনারা কেমন আছেন?'

'ভালো'

'গতকালের ঘটনার আর কোন প্রতিক্রিয়া আছে?'

'খারাপ নেই। ভাল প্রতিক্রিয়া হলো, আপনাকে আদিবাসীরা দেবতা ভাবতে শুরু করেছে।'

'ভাই সাহেব কি আশে-পাশে আছেন?'

'আছেন। দিচ্ছি।' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'হ্যালো ভাই সাহেব, কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনাকে কনগ্রাচুলেশন সাকসেসফুল মিশনের জন্যে। সত্যি আল্লাহ আপনাকে খাসভাবে সাহায্য করেন।' বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

'আলহামদুলিল্লাহ। আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

‘অনুরোধের প্রশ্ন কেন? বলুন কি’

‘হাইওয়ে থেকে ভ্যালিতে ঢোকার পথে, ভ্যালি মাঠটায় এবং ভ্যালি উপকূলে ল্যান্ডিং ডকটায় আপনি পাহারা বসান। তাদের বলুন অপরিচিত লোকদের দেখলে যেন আপনাদের খবর দেয়।’

‘কেন আপনি কি কোন আশংকা করছেন?’

‘সে রকম কিছু নয়, তবে আমার মন বলছে, আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।’

‘যদি সে রকম হয়, তাহলে আমরা কি করব?’

‘লোকতেদর একত্রিত করবেন। যারা আসবে, তাদেরকে সার্চ করতে দেবেন। আমাদের না পেলেই তারা চলে যাবে। আরেকটা বিকল্প হলো, লোকদের একত্রিত করবেন সশস্ত্রভাবে এবং যারা আসবে তাদের প্রতিহত করবেন।’

‘আপনার বিকল্পটাই গ্রহনযোগ্য। শংকরাচার্যের লোকেরা যদি ভ্যালিতে আসেই, তাহলে গতকালের ঘটনার তারা প্রতিশোধ নেবে। তাছাড়া আমাদের যদি চিনতে পারে, তাহতে তো অবস্থা আরও খারাপ হবে। সুতরাং বাধা দেওয়াই ভাল।’

‘ঠিক আছে। আমিও আপনার সাথে একমত। তবে ভাই সাহেব, ভ্যালিতে যদি কেউ যায়ই, তাহলে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটনাকে ডিলে করার চেষ্টা করবেন। অথবা যারা যাবে তার আপনার প্রস্তুতির বিষয় জানার আগেই তাদের শেষ করতে পারলে সেটাই ভাল হবে।’

‘এখানেও আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে অবস্থা অনুসারেই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।’

‘ভাই সাহেব, এখন সাড়ে ৯টা। আমার খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ।’

‘ইনশাআল্লাহ। ছোট ভাই, দোয়া করুন, আমার শান্তির ভ্যালিটাকে আল্লাহ যেন রক্ষা করেন।’

‘আমিন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে রাখি। আপনারা আসুন। খোদা হাফেজ।’

আহমদ মুসা মোবাইল রাখল।

শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক সবারই মুখ উদ্বেগাকুল। আহমদ মুসার কথায় তারা বুঝেছে যে ভ্যালিতে তারা যাচ্ছে, সেখানেও বিপদ।

আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই সাহারা বানু বলে উঠল, ‘বেটা সেখানে কিছু হয়েছে, কোন বিপদ ঘটেছে?’

‘খালাম্মা এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা বিপদের মধ্যেই আছি।যে কোন জায়গায় যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আবার কিছু নাও ঘটতে পারে। আমি ওদের একটা আশংকার কথা বলেছি। যাতে ওরা সতর্ক থাকে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আল্লাহ সহায় হোন, কিছু না ঘটুক বেটা।’ বলল সাহারা বানু।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘খালাম্মা কিছু ঘটা দরকার, ওদের আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ানো দরকার। তাহলেই না বুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি এবং আরও সামনে এগুনো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। যদি তারা আমাকে ওদের হাতে আত্মসমর্পণের জন্যে এখানে আসতে বাধ্য না করতো, তাহলে এত সহজে ও এত তাড়াতাড়ি আপনাদের উদ্ধার করা সম্ভব হতো না।’

‘তাই বলে বিপদেকে ওয়েলকাম করছেন স্যার?’

আলোচনায় শরিক হলো তারিকও।

‘বিপদকে নয় তারিক। শত্রুপক্ষ অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াক, সেটাই কামনা করছি। তাতে নতুন কিছু জানাও যেতে পারে। আহমদ শাহ আলমগীর এখনো উদ্ধার হয়নি। আমি অনুমান করি কোথায় তাকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেটা নিশ্চিত নয়। আরও নিশ্চিত হওয়া যায় কিনা এবং ঐ জায়গা সম্পর্কে আরও খবর জানা যায় কিনা দেখতে হবে। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে তাকে বাঁচানো কঠিন হতে পারে। আমি বুছতে পারছিনা, আহমদ শাহ আলমগীরের ব্যাপারে তারা এত সিরিয়াস কেন? শুধু সুষমা রাও এর কারণ হতে পারেনা। রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছতে..........।’

আহমদ মুসার কথার মাঝখানে কথা বলে উঠল সাহারা বানু। বলল সে, 'স্যরি বেটা, একটা সাংঘাতিক কথা মনে পড়ে গেছে। আগে এটা শোন। তোমার জিজ্ঞাসার জবাব এতে পেতে পার।'

মুহূর্তখানেক থেমেই সাহারা বানু বলা শুরু করল, 'শংকরাচার্যের লোকেরা আমাদের অনেক জিজ্ঞসাবাদ করেছে। এর মধ্যে একটা বাক্সের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সবচেয়ে বেশি। বলেছে, এই বাক্স না পেলে আহমদ শাহ আলমগীর কিংবা তোমাদের কাউকে আমরা ছাড়ব না। তোমাদের ধরাই হয়েছে এই বাক্স আদায়ের জন্যে। আহমদ শাহ আলমগীর তার চোখের সামনে তার মা ও বোনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখবে, যাতে মুখ খুলতে বাধ্য হবে। আবার তোমরা তোমাদের চোখের সামনে আহমদ শাহ আলমগীরের মর্মান্তিক পরিণতি দেখবে এবং তোমাদেরও মুখ খুলতে হবে। এসবের আগেই তোমরা যদি বাক্সের সন্ধান দাও, তাহলে তোমরা সকলেই বেঁচে যাবে। বাক্সের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কোন বাক্সের কথা বলছে, আমরা বুঝতেই পারিনি। আমি বললাম, কোন বাক্সের কথা বলছেন আপনার? কি আছে তাতে? জবাবে ওদের সর্দার লোকটি ইংরেজিতে বলল, চন্দন কাঠের একটি বাক্স। ওতে আছে আমাদের ঋষি রাজা শিবাজীর তৈরি মহামূল্যবান একটি দলিল, মোগল ধনভান্ডারের একটা নক্সা এবং আরও কিছু। আমে বলেছিলাম, এ বাক্স আমি দেখিনি। বাক্সটি আমাদের কাছে আসবে কেন? তিনি ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলেছিলেন, ভনিতা রাখুন, বাক্সটি আপনাদের কাছেই আছে। আন্দামানে আপনাদের প্রথম পুরুষ মোগল শাহজাদা ফিরোজশাহ যখন কয়েদী হিসাবে আন্দামানে আসেন, তখন তার সাথে চন্দন কাঠের এই বাক্সটি ছিল। শত বিপদে সবকিছু ছাড়তে হলেও তিনি বাক্সটি ছাড়েন নি, তিনি কি বাক্সটিকে পারিবারিকভাবে হেফাজত না করে পারেন? পারেন না। অতএব বাক্সটি আপনাদের কাছে আছে, এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। আমি তখন বলি, কিন্তু আমরা কেউ জানি না। সে বলে, জানেন কিনা দেখা যাবে। কাল সকালে এক ভয়ংকর শয়তান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। তারপর সবাইকে প্যাক করে আহমদ শাহ আলমগীরের কাছে নিয়ে যাব। তারপর দেখব আহমদ শাহ আলমগীর মা-বোনের অপমান কতটা সহ্য করতে পারে, আর

তোমার চোখের সামনে সন্তানের আকাশ-ফাটানো আর্তচিৎকার কতটা সহ্য করতে পার দেখব। সে যেতে উদ্যত হয়েও আবার বলে, হ্যাঁ আরেকটা সুখবর শোন। এ হারামজাদা যদি কালকে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে এক মহাঘটনার জন্যে তৈরি থেকো? তারপর চলে যায় সে।'

আহমদ মুসা চোখ নিচু করে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সাহারা বানুর কথা। বাক্সের কথা ও বাক্সের ভিতরের জিনিসের কথা ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার। তাহলে শংকরাচার্যের এই রকাক্ত মিশনের সাথে শুধু আন্দামানের ব্যাপার নয় ইতিহাসের একটি বিষয় এবং অর্থযোগও রয়েছে। তার বিস্ময় জাগল, মোগল অর্থভান্ডার কি এখনো গোপনই রয়ে গেছে, তার মনে পড়ল রাশিয়ার জারদের গুপ্তধনের কথা। তাহলে সব রাজবংশই কি তাদের জন্য গোপন অর্থভান্ডার গড়ে তোলে? হতে পারে, এটাই সে সময়ের চলমান বাস্তবতা। তার মনে আরও প্রশ্ন জাগল, শিবাজীর মহামূল্যবান দলিল মোগলদের বাক্সে কেন? কি আছে ওতে? আর ফিরোজ শাহ এত বিপদের মধ্যেও বাক্সটি ছাড়লেন না কেন? সাথে করে তা নিয়ে এলেন আন্দামানে?

এসব চিন্তায় নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল আহমদ মুসা। সাহারা বানু থামলেও তাই কথা বলতে দেরি হলো আহমদ মুসার।

চিন্তায় ছেদ টেনে কথা বলল আহমদ মুসা। বলল, 'খালাম্মা, আমার মনে হচ্ছে বাক্সের কথাটা ওরা ঠিকই বলেছে। আহমদ শাহ আলমগীরকে বন্দী করে রাখার একটা বড় কারণ এটাই।'

'কিন্তু বেটা, কোন চন্দন কাঠের বাক্সতো আমরা দেখিনি।' সাহারা বানু বলল।

'কিছু মনে করবেন না খালাম্মা, এটা একটা বংশীয় গোপনীয়তার ব্যাপার, এমন কি হতে পারে যে, আপনি জানেন না কিন্তু আহমদ শাহ আলমগীর জানে?' বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সাহারা বানু। ভাবছিল সে। একটু পর বলল, 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। রাজা-বাদশাদের এটা শুধু ট্রেডিশন নয় আইনও। উত্তারধিকার সূত্রে আহমদ শাহ আলমগীর এমন কিছু পেতেও পারে।

কিন্তু একটা বিষয়, আহমদ শাহ আলমগীরের পিতার এমন কোন বিশেষ বা গোপন স্থান ছিল না যেখানে সে একটা জলজ্যান্ত বাক্স সংরক্ষণ করবে, অথচ আমি জানেত পারবো না।'

এমনও তো হতে পারে, বাক্সটি দৃশ্যমান কোন স্থানে নেই। বাড়ির ভেতরে বা বাইরে কোন অদৃশ্য জায়গায় ওটা রেখেছিলেন ফিরোজ শাহ। ফিরোজ শাহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয়টা সবাই জেনে আসছে এবং এই নিয়মেই আহমদ শাহ আলমগীর জেনেছে তার পিতার কাছ থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

'ঠিক বলেছ বেটা। বাক্সের বিষয়টা যদি সত্য হয়, তাহলে এটাই ঘটেছে।'

বলে একটু থামল সাহারা বানু। একটা ঢোক গিলে আবার বলল, 'আল্লাহর হাজার শোকর তারা আমাদের বন্দী করে আহমদ শাহ'র কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। আমাদের ক্ষতি দেখলে সে ওদেরকে বাক্সের কথা বলেও দিতে পারতো।'

'ঠিক খালাম্মা, এটা একটা বড় বাঁচা।' বলল আহমদ মুসা।

'আমরা বাঁচলাম, কিন্তু ভাইয়ার কি হবে, তার উপর তারা প্রতিশোধ নিতে পারে। কিছু ঘটে যায় যদি।' কম্পিত কন্ঠে বলল শাহ বানু।

'কোন ভয় নেই শাহ বানু। আমি নিশ্চত, ঐ বাক্স পাওয়া পর্যন্ত আহমদ শাহ আলমগীরকে তারা অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখবে।' আহমদ মুসা বলল।

'বাক্সের ব্যাপারটা কি সত্যি ভাইয়া?' শাহ বানু বলল।

'বিশ্বাস করা, বিশ্বাস না করা কোন দিকেই সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। তবে এরকম কিছু থাকা আমি অস্বাভাবিক মনে করি না।'

'কোথায় খোঁজা যেতে পারে সে বাক্স' বলল শাহ বানু।

বাক্স খোঁজা তাদের কাজ, আমাদের কাজ হলো আহমদ শাহ আলমগীরকে পাওয়া। তবে এই বাক্সটার সন্ধান করতে চাই। বাক্সটার সাথে দু'টি ইতিহাস জড়িত। এক, মোগলদের, দুই শিবাজীর। আমার মতে বাক্সের মোগল ধনভান্ডারের চাবি ও নক্সার চেয়ে শিবাজীর দলিলটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শোনার পর থেকে ঐ দলিলটার প্রতি আমার লোভ বাড়ছে।' আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার ভেতের কি কোন প্রকার লোভ আছে ভাইয়া?’ শাহ বানুর প্রশ্ন। তার ঠোঁটে ম্লান হাসি।

‘কেন আমি মানুষ নই? মানুষ বলেই অন্য মানুষের যা আছে, আমারও তা থাকবে।’

‘কিন্তু মানুষ বলেই সবকিছু সবার মধ্যে সবার মধ্যে থাকবে, তা কি স্বাভাবিক ভাইয়া?’

মৌলিক মানবীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পার্থক্য যেটা দেখা যায় সেটা মেধা ও অনুশীলণগত কারণের ফল। অনুশীলন এমনকি মেধার ঘাটতি পূরণ করে। সুতরাং শিক্ষা বা চর্চা মানুষে মানুষে বিরাট পার্থক্য তৈরি করে, আবার তেমনি পার্থক্য দূরও করে।

‘আপনার ছাত্র অনুশীলন শুরু করেছে, দেখা যাক পার্থক্য কতটা দূর করে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দেখা তো শেষ হয়ে গেছে শাহ বানু। তার বন্দী হওয়া থেকে উদ্ধার পর্যন্ত সে সাহসের পরিচয় দিয়েছে। পুনরায় তোমাকে উদ্ধার করার সময় এক কঠিন মুহূর্তে ঠিক সময়ে সে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল। তারপর এই বোট চালানোর দায়িত্ব সে নেয়া পর্যন্ত সংঘাতকালীন সব পর্যায়ে সে তার দায়িত্বের অংশ ঠিকঠাক পালন করেছে। আমি তার হাতে রিভলবার তুলে দেইনি। সবার হাতে রিভলবার উঠুক আমি চাই না, তোমাদেরও চাওয়া উচিত নয়।’

‘কিন্তু ভাইয়া, রিভলবারের ব্যবহারই কিন্তু আমাদের উদ্ধার করতে এবং এ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।’ বলল শাহ বানু।

‘ঠিক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে রিভলবারের যেটুকু ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছিলেন।’

‘প্রয়োজনকালে সময়ের জন্যে প্রস্তুতি তো তাহলে অপরিহার্য।’ শাহ বানু বলল।

‘তার মানে তুমি তারিকের হাতে রিভলবার তুলে দেবেই। এটাই স্বাভাবিক। মোগল রক্তের সাথে তাদের সামরিক বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য।

‘কিন্তু ভাইয়া, রিভলবার হাতে দেওয়ার চেয়ে তুলে নেওয়াই বেশি স্বাভাবিক।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল তারিককে উদ্দেশ্য করে, ‘এবার তুমি জবাব দাও তারিক। নিজের বোঝা নিজেই বহন করা উচিত। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ স্যার।’

বলে একটু থামল। শুরু করল পরক্ষণেই, ‘অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া মোগল ট্রেডিশনে আছে। মোগল সম্রাজ্ঞীরা মোগল সম্রাটের হাতে তলোয়ার তুলে দিতেন যুদ্ধ যাত্রার সময়।’

বিব্রতকার একটা ভাব দেখা দিল শাহ বানুর চোখে-মুখে। লাল হয়ে উঠেছে তার মুখ। বলল, ওটা একটা আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার। যুদ্ধ যাত্রার সময়ে ওটা একটা বাড়তি উৎসাহের বিষয়। সম্রাটরা কিন্তু যোদ্ধা হিসাবেই সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছেন।’

‘অস্ত্র হাতে পাওয়া যোদ্ধা হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বাধার সৃষ্টি করে না।’ বোটের সামনের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রেখেই বলল তারিক।

‘যোদ্ধা হওয়া যায়না কিংবা বাধা সৃষ্টি হওয়ার কথা আমি বলিনি। আমার বলার বিষয় হলো মানসিকতা। যুদ্ধ বা সংগ্রামের জন্যে নিজেই প্রস্তুত হওয়া এবং অন্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যে মানসিকতার বিরাট পার্থক্য রয়েছে’ বলল শাহ বানু।

‘যুদ্ধ বা সংগ্রামের যে মুখোমুখি হয়নি, যুদ্ধ-সংগ্রামের যে সুযোগই পায়নি, তার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির প্রশ্ন ওঠে না।’ বলল তারিক।

শাহ বানু হাসল একটু। বলল, ‘স্যরি আমার কথা টার্গেটেড নয়, আমি নীতি কথা বলেছি। আমি সব সময় মনে করি, আজ মুসলমানদের তো বটেই, প্রতিটি নাগরিকেরই তিনটি দায়িত্ব পালন করা দরকার। এক. সে যোদ্ধা হবে, দেশ ও জাতির জন্যে ডাক পড়লে যেন যুদ্ধে যেতে পারে। দুই. সে পুলিশ হবে যেন সে সমাজে আইন-শৃংখলা রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে এবং তিন. সে সংসার-ধর্ম পালনকারী একজন পরিপূর্ণ গৃহস্থ হবে। এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার প্রস্তুতি তাকে সব সময় সম্পূর্ণ করে রাখতে হবে।’

'ধন্যবাদ শাহ বানু।' বলল আহমদ মুসা উচ্ছসিত কন্ঠে। আহমদ মুসার সাথে ধন্যবাদ দিল তারিকও।

'তুমি চমৎকার একটা তত্ব সামনে এনেছ শাহ বানু।' আহমদ মুসা বলল।

'এটা আপনার কথা। আমি নতুন করে বললাম মাত্র। কোন এক ঘটনায় আপনিই একথা বলেছিলেন। ইন্টারনেট থেকেই আমি ও ভাইয়া এটা মুখস্থ করেছিলাম।' বলল শাহ বানু।

'ইন্টারনেঠে এটা আমি পড়িনি। কেউ বলেওনি। আমি জানতামও না। জানলে যোদ্ধা হওয়ার প্রস্তুতি অবশ্যই নিতাম।' তারিক বলল।

'আমাদেরকে কেউ বলেনি। আমরা ব্রাউজিং করে বের করেছি।' বলল শাহ বানু।

'তোমাদের ধন্যবাদ শাহ বানু। আমার নিজের জন্য স্যরি।' তারিক বলল।

তারিকের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'স্যরি নয় তারিক। জানার জন্যে ওটা কোন অপরিহার্য বিষয় নয় যে দুঃখ করতে হবে। যা হোক, তোমাদের সংক্ষিপ্ত বিতর্ক ভালো হয়েছে। তোমরা দু'প্রান্তে থাকলে কোন বিতর্ক জমবে ভালো। তবে কথা পরোক্ষ হয়েছে, সরাসরি হলে আরও ভাল হতো।'

'তুমি নতুন শুনছ তো বেটা! ওরা ওভাবেই কথা বলে। তারিক খুব শান্ত ছেলে, ভালো ছেলে। শুধু আত্মরক্ষা করে চলাই ওর অভ্যাস।' সাহারা বানু বলল।

'তার মানে আমি ভালো নই বলছ আম্মা?'

সাহারা বানু কথা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

আহমদ মুসা তার আগেই বলে উঠল, 'আমার বোন এমন হতেই পারে না। মা যখন নিজের সন্তানের সামনে অন্য ছেলে-মেয়ের প্রশংসা করেন, তখন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় যে, সেই মা নিজের ছেলের গুণগুলোকেই অন্যের মধ্যে দেখতে চান।'

'সবাইকে যিনি ভালবাসেন, তাকে এভাবেই ভাবতে হয় ভাইয়া।'

বলল শাহ বানু। তার কন্ঠ গম্বীর।

শাহ বানু থামতেই তারিক বলল, ‘দুর্লভ এই গুণ শাহ বানু।’

শাহ বানু তাকাল তারিকের দিকে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। তার আগেই আহমদ মুসা বলল, ‘এসব কথা এখন থাক। এস অন্যদিকে মনোযোগ দেই।’

বলে তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তারিক বোটের মাথার উপরের কভারটা আনফোল্ড করে দাও। উপর এবং আশ-পাশ কোথাও থেকে আমাদের কেউ দেখতে পাক তা চাই না।

‘আমরা তো সাগর দিয়ে চলেছি স্যার। আমাদের দেখবে কে?’ বলল তারিক।

‘টেলিস্কোপিক বাইনোকুলারের শক্তির কথা তোমার জানার কথা। পোর্ট ব্লেয়ারের উপকূলে বসে তোমার জামার রং পর্যন্ত কেউ বলে দিতে পারে।’

‘স্যরি স্যার।’ বলে তারিক বোটের কভার আনফোল্ড করার বোতাম টিপে দিল।

ঢেকে গেল বোটের উপরটা। তার সাথে চারদিক থেকে ঝালর নেমে এসে পাশের অনেকটা ঢেকে দিল।

আহমদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

‘বেটা, বাক্সের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না। তুমি কি এ নিয়ে আর কিছু ভেবেছ?’

‘আমার কিছু ভাবার দেখছি না। আপনি এ ব্যাপারে কিছু ভাবতে পারেন। আমি নিশ্চত বাক্সটি আপনাদের বাড়িতেই আছে। হতে পারে সেটা বাইরের কোন লকারে অথবা ভেতরের কোন লকারে।’

‘ভেতরের লকার কি?’ সাহারা বানু বলল।

‘ভেতরের লকার অর্থ বাড়ির দেয়াল অথবা ফ্লোরে কোন লকার রয়েছে। হতে পারে বাড়ি নির্মাণের সময় সেটা তৈরি করা হয়। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি দয়া করে উত্তর দিন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বল বেটা।’ সাহারা বানু বলল।

আহমদ মুসা প্রশ্ন শুরু কলল। শুরু হলো আলোচনা।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল মটর বোট।

এন্ডারসন দ্বীপ ও ইন্টারভূ দ্বীপের মাঝখান দিয়ে গ্রীন পয়েন্ট প্রণালী হয়ে এন্ডারসন দ্বীপের উত্তর প্রান্তে পৌঁছার পর আহমদ মুসার নির্দেশে বোটের উত্তরমুখী মাথা সোজা পূর্ব দিকে টার্ন নিল। এখান থেকে নাক বরাবর পূর্ব দিকে এগুলে গ্রীনভ্যালির মুখে পৌঁছা যাবে।

বোট এগিয়ে চলল গ্রীনভ্যালির ঐ মুখের দিকে।

আহমদ মুসা উঠে বোটের ফ্ল্যাগ-স্ট্যান্ডে ফিশিং বোটের একটা পতাকা গুঁজে দিল।

ফিরে এসে আহমদ মুসা বসতে বসতে বলল, সবাই মনে করুক যে এটা একটা ফিশিং বোট।'

বোট গিয়ে পৌঁছল গ্রীনভ্যালির মুখে।

মুখটা তিরিশ ফুটের বেশি প্রশস্ত হবে না। দু'পাশ থেকে সাঁড়াশির মত সবুজ বাহু মুখ পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুখ পেরোলেই বিশাল হ্রদের মত এক বিশাল সরোবর। এ সরোবরের তিন প্রান্ত ঘিরেই গ্রীনভ্যালি। আবার কয়েক বর্গমাইলের গ্রীনভ্যালি ঘিরে সবুজ পাহাড়ের দেয়াল। অপূর্ব দৃশ্য।

মুখটা পেরিয়ে বোট ভেতরে প্রবেশ করতেই সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল সবাই, 'ওয়ান্ডারফুল', অবিশ্বাস্য!'

তাদের সামনে শান্ত সরোবরের অগাধ কাল জলরাশি। এর ওপারে উপত্যকার সবুজ সমুদ্র এবং তাতে সবুজ চাদরে ঢাকা পাহাড়ের দেয়াল।

শাহ বানুরা যখন গ্রীনভ্যালির সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, তখন আহমদ মুসার চোখের দূরবীণ গ্রীনভ্যালির ছোট ও একমাত্র ল্যান্ডিং প্ল্যাটফরমের উপর নিবদ্ধ।

আহমদ মুসার চোখে-মুখে কৌতূহল। ল্যান্ডিং প্ল্যাটফরমে অপরিচিত দু'টি মাঝারি আকারের বোট দাঁড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা বোট দু'টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল।

বোটে কোন পতাকা নেই। কোন বিশেষ মার্কসও দেখা যাচ্ছে না বোটের গায়ে।

বোটে কোন মানুষ আছে কিনা খুঁজতে লাগল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার ভাগ্য ভাল, একজন লোক বোটের চাঁদোয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে বোটের মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। তার পোশাক সাধারণ, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আরও ভালভাবে দেখতে লাগল লোকটাকে আহমদ মুসা। কিন্তু দেখা হলো না। লোকটি বোটের চাঁদোয়ার তলে আবার এল।

আহমদ মুসা দূরবীন রেখে উঠে গিয়ে ফিশিং বোটের পতাকা নামিয়ে ফেলল বোটের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড থেকে।

ফিরে এস চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'ঘাটে আরও দু'টি অপরিচিত বোট নোঙর করা।'

'তাতে কি স্যার? ঘাটে তো অনেকেরই বোট থাকতে পারে।' বলল তারিক।

'ওটা প্রাইভেট ঘাট। ওখানে তাদের নিজেদের বোট ছাড়া কোন বোট থাকে না, রাখার লোকও নেই গ্রীনভ্যালির ত্রিসীমানায়।'

'তাহলে?' বলল সাহারা বানু।

'বোটে একজন লোককেও দেখতে পেয়েছি। সে আদিবাসী নয়। অথচ এই গ্রীনভ্যালি ও এর আশে-পাশের এলাকায় আমার আপা সুস্মিতা বালাজী ও তার স্বামী ড্যানিশ দেবানন্দ ছাড়া অআদিবাসী কোন লোক নেই।'

'বোট তাহলে এল কোত্থেকে? তাও একটি নয় দু'টি।'

ভাবছিল আহমদ মুসা

একটু পর বলল, 'এর একটাই ব্যাখ্যা যে, শংকরাচার্যের লোকেরা এখানে এসেছে।'

উদ্বেগের ছায়া নামল শাহ বানুদের চোখে-মুখে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তারিক, তুমি পেছনে এস।'

তারিক ড্রাইভিং সীট ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সীটে বসল। বোটের গতি বেড়ে গেল।

'ওদের কোন বিপদ হয়নি তো বেটা? আমরা আবার ওখানে যাচ্ছি।

'কিছু ভাববেন না খালাম্মা। সবকিছুই আল্লাহর ফায়সালার অধীন। আমাদের দায়িত্ব হলো, আমাদের কাছে যেটা কল্যাণকর মনে হবে, সেটাই করা।

'আল্লাহ আমাদের সহায় হোন বেটা।'

'আমিন' বলল সকলে।

আহমদ মুসা দ্বিধা-সংকোচহীন গতিতে বোট নিয়ে নোঙর করল অপরিচিত একটি বোটের পাশে।

একটি বোট আসতে দেখে অপরিচিত বোটের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ তার দু'টি চোখ তাকিয়েছিল আহমদ মুসাদের দিকে। তার একটি হাত পকেটে।

লোকটির পকেটের হাতে যে রিভলবার তা বুঝতে বাকি রইল না আহমদ মুসার। এই লোকটিকেই আহমদ মুসা দূরবীনে দেখেছিল।

বোট নোঙর করেই আহমদ মুসা পাশের বোটের সেই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি একাই আছ? মহাগুরুজীরও তো থাকার কথা ছিল। তিনিও গেছেন ওদের সাথে?'

'তুমি কে' আহমদ মুসার কোন প্রশ্নেরই জবাব না দিয়ে বলল লোকটি।

'তুমি চিনবে না। মহুগুরুজীর সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসছি। ভেতরে যাদের দেখছ, ওদেরই নিয়ে আসার কথা।' বলল আহমদ মুসা।

লোকটি বোটের ভেতরে বসা শাহ বানুদের দিকে একবার তাকিয়ে একটু চিন্তা করল। বলল, 'এঁদেরকেই মহাগুরুজী মানে আমরা সন্ধান করছি?'

'হ্যাঁ।' বলল আহমদ মুসা

এতক্ষণে লোকটি স্বাচ্ছন্দ ফিরে পেল। বলল, 'হ্যাঁ, মহাগুরুজী সকলকে নিয়ে উপরে গেছেন। আমি বোট ও গোলাগুলী পাহারা দিচ্ছি। আ.........।'

আহমদ মুসা তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'কেন সবাই গোলাবারুদ সাথে নিয়ে যাবার কথা। নিয়ে যায়নি?'

‘না, বাড়তি গোলাবারুদ নিয়ে যায়নি। ওঁরা গিয়ে অবস্থা দেখে প্রয়োজন হলে দু’জন লোক পাঠাবেন গোলাগুলী নিয়ে যাবার জন্যে।’ বলল লোকটি।

‘একটু কথা বলার দরকার মহুগুরুজীর সাথে। ওরা কখন গেছেন, কয়জন গেছেন?’ আহমদ মুসা বলল।

‘পনের জন, পনের-বিশ মিনিনট হলো।’ বলতে বলতে লোকটি পকেট থেকে মোবাইল বের করল।

আহমদ মুসা ঐ বোটে গিয়ে উঠল। বলল, ‘মোবাইল আমাকে দাও। ওর নাম্বার আমি জানি।’

লোকটি মেবাইল তুলে ধরল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা ডান হাতে মোবাইলটি নিল তার কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বাম হাত দিয়ে রিভলবার বের করে তার মাথায় চেপে ধরল।

লোকটি ভূত দেখার মত চমকে উঠে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল।

আহমদ মুসা শান্ত গলায় শান্তকন্ঠে বলল, ‘রিভলবার বের করার চেষ্টা করো না। তার আগেই মাথা ছাতু করে দেবে।’

আহমদ মুসা লোকটির কাছ থেকে নেয়া মোবাইলটি পকেটে রেখে হাত দিয়ে লোকটির পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। তারপর এক ধাক্কা দিয়ে লোকটিকে বোটের উপর ফেলে দিল। বলল তারিককে উদ্দেশ্য করে, ‘ব্যাগে দেখ ক্লোরোফরম আছে। দু’টুকরো তুলা ভিজিয়ে ওর নাকের দু’ছিদ্রে গুঁজে দাও।’

তারিক এল। সে লোকটির মুখ বাম হাতে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে দু’টুকরো ক্লোরোফরম ভেজা তুলা লোকটির নাকের দু’ছিদ্রে গুঁজে দিল। তারপর ডান হাত দিয়ে লোকটির বুক চেপে দিল কয়েকবার।

লোকটি নিশ্বাস বন্ধ করেছিল, সেটা খুলে গেল।

লোকটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

‘তারিক তুমি ওই বোটে দেখ গোলাগুলী কোথায় আছে বের করে নিয়ে এস। আমি এ বোটে দেখছি।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা এ বোটে অস্ত্র-শস্ত্র কিছু পেল না, একটা ব্যাগ পেল। ব্যাগে ডাইরী এবং কাগজ পত্র দেখতে পেল একটা ফাইলে। আহমদ মুসা ব্যাগটি কাঁধে তুলে নিল।

ওদিকে তারিক একটি গ্রেনেড লাঞ্চার ও একটা লাইট মেশিণগান সহ দু'বাক্স এ্যামুনিশন নিয়ে ঐ বোট থেকে নেমে এল।

আহমদ মুসা শাহ বানুদেরও নামিয়ে নিল বোট থেকে।

আহমদ মুসা একটা ব্যাগ পিঠে, আরেকটা কাঁধে ঝুলাল। রকেট লাঞ্চার ও মেশিনগান নিল কাঁধে। কিন্তু গোলাগুলীর বাক্স দু'টি তারিক নিতে পারছিল না।

শাহ বানু এগিয়ে এসে একটা বাক্স নিতে চাইল।

'বেশ ভারী, তোমার কষ্ট হবে।' বলে তারিক বাক্সটি শাহ বানুকে দিতে চাইল না।

'মেয়েরা বোধ হয় কষ্ট করতে জানে না? মেয়েরা কোন দিন বোধ হয় যুদ্ধ করেনি?' বলল শাহ বানু ক্ষোভের সাথে।

'একটা বাক্স শাহ বানুকে দিয়ে দাও তারিক। একটা লোডেড রিভলবারসহ কিছু গুলীও তুমি দিয়ে দাও শাহ বানুকে। শাহ বানু ভাল গুলী চালাতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

গুলীর বাক্সটা কাঁধে নিয়ে রিভলবারটা ওড়নার নিচে কামিজের কোন গোপন পকেটে রেখে দিল। তারপর আহমদ মুসার উদ্দেশ্যে বলল, 'ধন্যবাদ ভাইয়া আমার প্রতি আস্থার জন্য।'

চারজনের যাত্রা শুরু হলো। প্রথমে আহমদ মুসা, তারপর শাহ বানু, শাহ বানুর পরে সাহারা বানু ও সবশেষে তারিক।

উপকূলের পর কয়েকটা চড়াই-উৎরাই বেয়ে উপত্যকার সমভূমিতে উঠতে হয়। চড়াই-উৎরাই সবটাই ঘন-জংগলে আচ্ছাদিত। তার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট একটা পায়ে চলার পথ।

দু'টি চড়াই পার হয়ে এসেছে আহমদ মুসারা। তৃতীয় চড়াইয়ের মাথায় পৌঁছে গেছে তারা। আরেকটা চড়াই-উৎরাই এর পরেই উপত্যকা। তৃতীয় চড়াই

এর মাথায় উঠেছে আহমদ মুসা। তার পেছনে শাহ বানুও চড়াইয়ের মাথায় এসে গেছে। সাহারা বানু এবং তারিকও উঠছে চড়াইয়ের মাথায়।

আহমদ মুসা উৎরাই বেয়ে নামার যাত্রা শুরু করেছে। দু'ধাপ এগিয়েছে। এ সময় দু'পাশের ঝোপ থেকে দু'জন যবক স্টেনগান বাগিয়ে বেরিয়ে এল। আহমদ মুসার পথ রোথ করে দু'জন পাশাপাশি দাঁড়াল। তাদের স্টেগানের নল আহমদ মুসা, শাহ বানু সকলকেই কভার করেছে।

আহমদ মুসা দাঁড়িয়ে গেছে। তার বাম হাত কাঁধের মেশিনগান ও গ্রেনেড লাঞ্চার ধরে রেখেছে। আর ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে এবং পকেটে রিভলবারের বাট ধরে আছে।

আহমদ মুসা হাত বের করতে গিয়েছিল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'হাত বের করার চেষ্টা করে না। হাত বের করার আগেই ডজন খানেক গুলী তোমার শরীরে ঢুকে যাবে। এতক্ষণ গুলী ঢুকে যেত, কিন্তু মৃত্যুর আগে তোমাকে একটা কথা শোনাতে চাই। তুমি এ পর্যন্ত আমাদের যত লোক মেরেছ, তার দ্বিগুণ লোককে আমরা এই উপত্যকায় আজ হত্যা করব।'

বলে সে স্টেনগানের ট্রিগার টানা শুরু করেছিল।

শাহ বানুর বাম হাতে তার কাঁধের গুলীর বাক্স ধরা ছিল। আর তার ডান হাত ছিল স্বাভাবিকভাবেই ওড়নার নিচে। ওড়না কোমর পর্যন্ত নেমে যাওয়া।

শাহ বানু তাদের সামনে যমদূতের মত দু'স্টেনগানধারীকে উদয় হতে দেখ প্রথমটায় ঘাবড়ে যায় পরে সাহস ফিরে পায় এবং কামিজের পকেট থেকে রিভলভবার বের করে নেয়।

শাহ বানু আহমদ মুসার কয়েক গজ পেছনে ছিল এবং দু'স্টেনগানধারী ও তার মাঝে কোন আড়াল ছিল।

ষ্টেনগানধারী যখন কথা শেষ করল, শাহ বানু বুঝল কি ঘটতে যাচ্ছে। সমস্ত সত্তা যেন তার কেঁপে উঠল। সে সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করে ওড়নার তলে তার রিভলবার সেট করল প্রথম ষ্টেনগানধারীকে লক্ষ্য করে। ওরা উৎরায়ের কিছুটা নিচে দাঁড়ানো থাকায় সুবিধা হলো টার্গেট করায়।

ষ্টেনগানধারী যখন তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টানছিল, তখন শাহ বানু তার রিভলবারের ট্রিগার টিপে দিয়েছে। একটি গুলী বেরিয়ে গেল রিভলবার থেকে। সে গুলীর ফলাফলের অপেক্ষা না করে ট্রিগারে দ্বিতীয় আরেকটি চাপ দিল সে।

দু'টি গুলীর একটি গিয়ে বিদ্ধ করেছে প্রথম ষ্টেনগানধারীর বুকে এবং দ্বিতীয়টি মাথায়।

প্রথম গুলী গিয়ে ষ্টেনগানধারীকে বিদ্ধ করতেই আহমদ মুসা রিভলবার ধরা তার হাত পকেট থেকে বের করে নিয়েছে। সে টার্গেট করল দ্বিতীয় ষ্টেনগানধারীকে। শাহ বানুর দ্বিতীয় গুলী এবং আহমদ মুসার গুলী প্রায় এক সাথেই হলো।

দু'ষ্টেনগানধারীর গুলীবিদ্ধ দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ে অল্প একটু গড়িয়ে স্থির হয়ে গেল।

শাহ বানু নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে তার গুলীতে নিহত প্রথম ষ্টেনগানধারীর দিকে। সে গুলী করেছে এবং লোকটি মরেছে- সবই যে তার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। কি করে এসব ঘটে গেল বুঝতে পারছে না সে। তার কাঁধ থেকে গুলীর বাক্স পড়ে গেছে। তার হাত যেন শিথিল হয়ে পড়েছে।

সাহারা বানু পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল শাহ বানুকে। বলল, 'ঠিক করেছ মা। আল্লাহর হাজার শোকর। আল্লাহ তোমাকে আরও সাহস দিক'।

আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বলল, 'খালাম্মা শুধু ঠিক কাজ করেছে তাই নয়, ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছে। একটু দেরি হলে ওর ষ্টেনগানের গুলী আমাকে 'এফোড়-ওফোড়................'।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। শাহ বানুর একটা হাত এসে আহমদ মুসার মুখের উপর চেপে বসল। বলল সে আর্তকণ্ঠে, এমন শব্দ উচ্চারণ করবেন না ভাইয়া। আমি কিছু করতে না পারলে আল্লাহ আপনাকে দিয়ে কিছু করাতেন আত্মরক্ষার জন্যে।'

'ঠিক শাহ বানু। আল্লাহ এটাই করেন'। গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

তারিক এগিয়ে এসেছে। সে বলল, 'ধন্যবাদ শাহ বানু। তোমার প্রথম রিভলবার চালনা ঐতিহাসিক হয়েছে এবং সফল হয়েছে। ঐতিহাসিক এই কারণে

যে, প্রথম গুলী আমার মত সকলের স্যার এবং মহানায়ক আহমদ মুসার প্রতিরক্ষায় বর্ষিত হয়েছে। পুরুষানুক্রমে এটা গল্প করা যাবে'।

শাহ বানু ফিরে তাকাল তারিকের দিকে। চোখে তার ভ্রুকুটি। বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারছি না। তুমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলেছ। ভাইয়া এ ধরনের প্রশংসা পছন্দ করেন না। তবে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি এ কারণে যে, আত্মরক্ষার উপযুক্ত প্রস্তুতি কত প্রয়োজন তা তুমি বুঝেছ'।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে তারিকের। ফুটে উঠেছে বিব্রতভাব। বলল, দুঃখিত বেশি বলে থাকলে। তবে বানানো কিছু বলিনি। আর আত্মরক্ষার প্রয়োজন ও প্রস্তুতির ব্যাপার একটি সার্বজনীন বাস্তবতা। এ উপলব্ধি কারও নেই, একথা ভাবা ঠিক নয়। প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য অবশ্যই থাকতে পারে'। তারিকের কণ্ঠ অনেকটাই অভিমান ক্ষুব্ধ।

মিষ্টি হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাদের বাকযুদ্ধ খুবই ভাল লাগে। তবে শাহ বানু, আমার ছাত্রের প্রতি তোমার শেষ কথাটা খুব কঠোর হয়েছে'।

'আমি দুঃখিত ভাইয়া। কিন্তু আপনার ছাত্রও শেষে নরম কথা বলেনি'। বলল শাহ বানু নরম কণ্ঠে।

'তারিক, শাহ বানু ঠিকই বলেছে'। সেই মিষ্টি হাসি আহমদ মুসার মুখে তখনও।

'আমি দুঃখিত স্যার'। তারও নরম কণ্ঠ।

'অতীতেও ওরা এমন বাক যুদ্ধ করে এসেছে। কিন্তু তোমার মত মধ্যস্থতাকারী ছিল না বেটা। আশা করি মতপার্থক্যের দূরত্বটা এবার দূর হবে'। বলল সাহারা বানু প্রসন্ন কন্ঠে।

আহমদ মুসা হাসি মুখে 'আমিন' উচ্চারণ করে তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি গুলীর বাক্সটা শাহ বানুকে তুলে দাও'।

সঙ্গে সঙ্গে তারিক নিজের বাক্সটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে শাহ বানুর বাক্সটা তুলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার আমি দু'বাক্স দু'কাঁধে সহজেই নিতে পারব। শাহ বানু ফ্রি থাক। এতে আমাদের উপকারই হবে'।

আহমদ মুসা কথা বলার আগেই শাহ বানু বলে উঠল 'মেয়েরাও ভার বহন করতে পারে। ঠিক আছে বাক্সটি আমিই তুলে নিচ্ছি'।

কথার সাথে সাথে শাহ বানু নিচু হয়ে বাক্সটি তুলে নিল কাঁধে।

আহমদ মুসা সেই মিষ্টি হেসেই বলল, 'খুবই আনন্দের কথা, মেয়েরা খুব আত্মসচেতন হয়ে উঠছে। তারা বাড়তি 'আনুকূল্য' নিয়ে নিজেদের ছোট করতে চায় না। ভেব না তারিক, শাহ বানুর ডান হাত ফ্রি থাকছে।

'স্যার, শাহ বানু কিন্তু সব সময়ই আত্মসচেতন। তার পরিচয়ের কারণেই হয়তো'। বলল তারিক।

শাহ বানু কথা বলার জন্য মুখ খুলেছিল। তার চোখে ভ্রুকুটি। কিন্তু তার আগেই দ্রুত আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আবার তারিক, তুমি বেশি বলে ফেলেছ। আমার ছোট বোনটি অহেতুক প্রশংসা পছন্দ করে না'।

'স্যরি স্যার'। সঙ্গে সঙ্গেই বলল তারিক।

আহমদ মুসার কথার ঢংয়ে ঠোঁটে হাসি ফোটে উঠল শাহ বানুর। সে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল, বোধ হয় হাসি আড়াল করার জন্যেই।

'ঠিক আছে তারিক, স্যরি গ্রহণ করা হল। এবার তুমি পেছনে লাইনে দাঁড়াও। আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে'।

বলে আহমদ মুসা থামল। তার চোখে-মুখে ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠল।

তারিক হটে গিয়ে সাহারা বানুর পেছনে তার জায়গায় ফেরত গেছে।

আহমদ মুসা রকেট লাঞ্চার পিঠে ঝুলিয়ে লাইট মেশিন গানটি হাতে নিল। ম্যাগজিন লোডেড কিনা পরীক্ষা করল। পকেট থেকে বের করে এক্সট্রা ম্যাগজিনও পরীক্ষা করে দেখল। তারপর লাইট মেশিনগানটি (এলএমজি) হাতে রেখেই তাকাল শাহ বানু তারিকদের দিকে। বলল, 'এরা দু'জন যাচ্ছিল বোটে অ্যামুনিশনের বাক্স আনার জন্যে। তার মানে সংঘর্ষ হবে, শংকরাচার্যরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অ্যামুনিশন না যাওয়া পর্যন্ত কোন সংঘাত হচ্ছে না, এটা বলা যায়। যদি এরা দু'জন অ্যামুনিশন নিয়ে ওদের কাছে না ফিরে যায়, তাহলে নিশ্চয় ওদের কেউ এদের খোঁজ খবর নিতে আসবে। যদি এটাই ঘটবে বলে আমরা মনে করি, তাহলে আমাদের ওদের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। এই

ধরনের গেরিলা আক্রমণে ওদের জান ও শক্তিক্ষয় আমাদের বিজয়কে সহজ করবে।

'তথাস্তু ভাইয়া'। বলল শাহ বানু।

তারা সকলে গিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল। সেখান থেকে উৎরাই বেয়ে নেমে যাওয়া অনেকখানি দেখা যায়। পল পল করে এক ঘন্টা কেটে গেল। একটা অপরিচিত গন্ধ এসে প্রবেশ করল আহমদ মুসার নাকে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল আহমদ মুসার কথা। আহমদ মুসারা গল্প করছিল ফিসফিসে কন্ঠে।

গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথেই আহমদ মুসার চোখ নেমে গেল পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে নিচের দিকে। দেখল দু'জন লোক আসছে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে। তাদের দু'জনের কাঁধেই ষ্টেনগান ঝুলানো।

রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করে আহমদ মুসা সবাইকে চুপ করতে বলল।

শাহ বানুরাও রাস্তার দিকে চোখ ফিরাল। উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। শাহ বানু বলল, 'আগের মতই দু'জন'।

ওরা দু'জন আহমদ মুসাদের অতিক্রম করে সামনে এগুলো। ষ্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে ওরা দ্রুত হাঁটছিল।

আহমদ মুসা এলএমজি ও গ্রেনেড লাঞ্চার মাটিতে নামিয়ে রেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বিড়ালের মত পা টিপে টিপে দ্রুত ওদের পেছনে চলে গেল।

আহমদ মুসা তার দু'হাতের দু'রিভলবার ওদের দু'জনের বাম পিঠে চেপে ধরে বলল, হাত তুলে উপুড় হয়ে শুয়ে............'।

আহমদ মুসার কথা শেষ হলো না। ওদের দু'জনের দু'হাত রিভলার সমেত বের হয়ে উপরে উঠল বিদ্যুত গতিতে।

আহমদ মুসা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল এই বেপরোয়া লোক দু'জন হাত উপরে তুলেই উপর থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলী করতে যাচ্ছে। আহমদ মুসার কাছে এটা বেনজীর ষ্টাইলের এক বেপরোয়া উদ্যোগ। এই দু'গুলির আওতায় যে আহমদ মুসা পড়তে পারে, এটাও আহমদ মুসা জানে।

আহমদ মুসার ভাবনার চেয়েও দ্রুত যেন মাথা থেকে নির্দেশ পৌঁছে গেল আহমদ মুসার দু'হাতের তর্জনিতে। দু'তর্জনি সঙ্গে সঙ্গেই চেপে ধরল দু'রিভলবারের ট্রিগার। আহমদ মুসা গুলী করেই ওদের গায়ের সাথে লেপ্টে গিয়ে ওদের দেহকে পুশ করল সামনের দিকে।

আহমদ মুসা গুলী করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদের রিভলবার থেকেই দু'টি গুলীর আওয়াজ হলো। কিন্তু ততক্ষণে ওদের দেহে গুলী লাগার ফলে ওদের দেহ ও হাতে কম্পনের ধাক্কা গিয়ে লেগেছে। রিভলবারের ব্যারেল ওদের নড়ে গিয়ে উপরে উঠেছে অনেক খানি। ফলে গুলী দু'টি আহমদ মুসার অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আহমদ মুসা ওদের দেহ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে। ওদের উপরে গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। তার দেহের সামনেটা রক্তে ভিজে গেছে।

গুলীবিদ্ধ দু'জনকে আহমদ মুসা চিৎ করল, দেখল, ওরা এখনও জীবিত থাকলেও কথা বলার পর্যায়ে নেই।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়া এসে সবাই আহমদ মুসার পাশে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমি এদের দু'জনকে মারতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম এদের কাছে জানতে ওদিকের অবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু বেপরোয়া এই লোকদের না মারতে পারলে, এরাই আমাকে মারত'।

বলে আহমদ মুসা তারিকের দিকে চেয়ে লোক দু'জনকে সার্চ করার নির্দেশ দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করল। নির্দিষ্ট কয়েকটি নাম্বারে চাপ দিল দ্রুত।

'হ্যালো'। ওপার থেকে সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আসসালামু আলাইকুম। আপা, ওদিকের খবর কি?'

'ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ছোট ভাই, আপনি কোথায়? ভাল আছেন?' সুস্মিতা বালাজী বলল।

'আমরা উপত্যকার মুখে। তৃতীয় উৎরাই হয়ে নামছি আমরা'।

‘আলহামদুলিল্লাহ। ওদিকে অনেক গুলীর শব্দ শুনলাম। কি ঘটনা?’

‘অনেকগুলো নয়, ছয়টি গুলীর আওয়াজ শুনেছেন। তার দু’টি আওয়াজ ওদের রিভলবার থেকে। অবশিষ্ট চারটি গুলী আমাদের। চারটি গুলীতে ওদের লোক কমেছে চার জন। ওদিকের অবস্থা বলুন আপা’।

‘অবস্থা এখনও খারাপ হয়নি ছোট ভাই। ওরা নৌপথ ও স্থলপথ দু’দিক থেকে দু’গ্রুপ এসেছে। আমাদের স্কুলের মাঠে ওরা ক্যাম্প করেছে। ওরা পঁচিশ জন। আগের মতই ওদের সবার কাছে ষ্টেনগান। আরও ভারী অস্ত্র নাকি ওদের আসবে। আমাদের লোকদের চার ভাগ করে চার জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এক গ্রুপ আমাদের বাড়ির সামনে, দ্বিতীয় গ্রুপ স্কুলের সামনে হইওয়ের দিক থেকে আসা রাস্তার পাশে, তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রুপ স্কুলের উত্তরে আমাদের গোটা বসতিকে সার্কেল করা রাস্তায় উঠার মুখে গোপনে মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। ছোট ভাই, আমরা আপনার অপেক্ষা করছি’।

‘ঠিক আছে আপা। লোকদের গোপনে মোতায়েন ঠিক হয়েছে। ক্ষতি এড়াবার জন্যে সম্মুখ সংঘর্ষ এড়াতে হবে। আপা, ভাই সাহেবের সাথে একটু কথা বলব’।

‘দিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সালাম ছোট ভাই’।

বলে সুস্মিতা বালাজী টেলিফোন দিয়ে দিল ড্যানিশ দেবানন্দকে।

ড্যানিশ দেবানন্দের সাথে সালাম বিনিময়ের পর আহমদ মুসা বলল, ‘আপার কাছে সব শুনলাম। আমি তাঁকেও বলেছি আমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এ্যাকশনে এনে ওদের ক্ষতি করতে হবে। দুর্বল হয়ে পড়লে চূড়ান্ত আঘাতের সময় আসবে’।

‘সুবিধা হয়েছে ছোট ভাই, আমাদের স্কুলের গার্ডকে ওরা কাজে লাগিয়েছে। গার্ড খুব শক্ত, চালাক ও বিশ্বস্ত। তার কাছে মোবাইল আছে। মাঝে মাঝে সে খবর পাঠাচ্ছে। তার কাছেই শুনলাম, দু’জন লোক পাঠিয়েছে তারা বোটে কি কাজের জন্যে। কিন্তু ফিরে আসেনি। তার উপর গুলির শব্দ শুনে তারা উদ্বিগ্ন। খোঁজ নেবার জন্যে আরও দু’জন লোক পাঠিয়েছে। ওর টেলিফোন পাওয়ার পর আবার গুলীর শব্দ শুনলাম। কি ব্যাপার?’ বলল ড্যানিশ দেবানন্দ।

‘ঐ দু’জনও মারা গেছে ভাই সাহেব’। আহমদ মুসা বলল।

‘থ্যাংকস আল্লাহ। ছোট ভাই, আপনার এখন পরিকল্পনা কি। আমরা তো আপনার অপেক্ষা করছি’।

‘আমি তৃতীয় উৎরাইয়ে ওদের জন্যে আরও অপেক্ষা করব। ওদের দু’টি গ্রুপ শেষ হয়েছে। এদের খোঁজ নিতে আরও লোক পাঠাবে। না এসে ওদের উপায়ও নেই। ভারী অস্ত্র তারা বোটে রেখে এসেছে। এই অস্ত্র তারা চায়, তাদের দরকার। সুতরাং লোকদের খোঁজে, অস্ত্রের খোঁজে তারা আসবে। আর তাদের এই পেছনটা ঝুঁকিপূর্ণ রেখে তারা সামনে আপনাদের দিকে এগুবে না। তাই আমি মনে করছি, তারা পেছনটাকে নিরাপদ করার জন্য এমনকি সর্বশক্তিও নিয়োগ করতে পারে’। বলল আহমদ মুসা।

‘ওদের মহাগুরু শংকরাচার্য কি এই অভিযানে আছে ছোট ভাই?’ জিজ্ঞাসা ড্যানিশ দেবানন্দের।

‘নৌপথে বোটে করে যে দলটি এখানে এসেছে, তার সাথে শংকরাচার্য এসেছেন। উনি এখন আপনাদের স্কুলে নিশ্চয়’।

‘সে শয়তানের মত ষড়যন্ত্রকারী। সে কখন কোন দিকে কি করবে বলা মুস্কিল। তাকেই আমার ভয়, ছোট ভাই’।

‘গত কয়েক সপ্তাহ তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ভয় করবেন না ভাই সাহেব’।

‘থ্যাংকস আল্লাহ। ছোট ভাই আপনি আসার পরই শুধু এই পরিবর্তন ঘটেছে’।

‘আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতিত্বটা আমাকে দিচ্ছেন কেন ভাই সাহেব। বলুন, আল্লাহ আন্দামানের উপর নজর দেয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে’।

‘স্যরি। আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে সময় লাগবে’।

‘ধন্যবাদ ভাই সাহেব। আল্লাহ সাহায্য করুন’।

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। শুরু করল আবার, ‘শুনুন ভাই সাহেব, ওরা যদি এদিকে না এগোয়, তাহলে আমিই এগুব এবং ওদের পেছন থেকে উদের উপর চড়াও হবো। আর আপনাদের লোক যেভাবে আছে, সেভাবেই

থাকবে। যদি শংকরাচার্যের লোকরা আমার এদিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে, তাহলে সব গোপন স্থান থেকে একসাথে ব্ল্যাংক ফায়ার করতে হবে। যাতে ওরা কোন এক দিকে অগ্রসর হতে না পারে এং অগ্রসর হতে চাইলে যেন বিভক্ত হয়ে সব দিকে অগ্রসর হয়। এতে ওদের বিভক্ত করে মার দেয়া সহজ হবে'।

'ধন্যবাদ ছোট ভাই। আর কোন পরামর্শ?'

'আপাতত নয়'।

'সাহারা বানু, শাহ বানুরা কেমন আছে ছোট ভাই?'

'ভাল আছে ভাই সাহেব'।

'থ্যাংকস আল্লাহ'।

'এখন টেলিফোন রাখছি। আসসালামু আলাইকুম'।

সালাম দিয়ে ওপার থেকে ড্যানিশ দেবানন্দ টেলিফোন অফ করল।

আহমদ মুসা মোবাইল অফ করে পকেটে রেখে বলল, এস তারিক লাশ দু'টো জংগলে লুকিয়ে ফেলি'।

এগিয়ে এল তারিক। বলল, 'আমরা কি এখানে অপেক্ষা করব?'

'এখানে নয়, আরও সামনে গিয়ে ঐ দু'টিলার পেছনে গিয়ে অপেক্ষা করব। টিলার উপর থেকে নিচে অনেক দূর দেখা যাবে। আর দু'টিলার মাঝখান দিয়ে যে পথ তা সংকীর্ণ। শত্রুদের এখানে ট্রাপে ফেলা আমাদের জন্য অনুকূল হবে'।

'ওরা আসবে নিশ্চিত?'

'কোন কিছুই নিশ্চিত নয়। আমাদের এটা আশা মাত্র। ওদের এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করে মোকাবিলা করার আশা আমাদের সফল নাও হতে পারে'।

'বুঝেছি স্যার'।

বলে লাশ্বম টেনে নেয়ার জন্যে হাত লাগাল তারিক। আহমদ মুসাও। লাশ দু'টো ঝোপের আড়ালে রেকে সামনে এগিয়ে টিলার কাছে চলে এল আহমদ মুসারা'।

টিলাটা অদ্ভুত ধরনের। দু'পাশের জংগলে কতকটা দেয়ালের আকারে টিলাটা বিস্তৃত। কিন্তু দু'পাশ থেকে রাস্তায় এসে টিলাটা গেটের আকার নিয়েছে। রাস্তার দু'পাশের দু'টিলা যেন গেটের স্তম্ভ।

গেটের এ পাশটায় বড় একটা গাছ। গাছটার ডাল-পালা প্রায় ঢেকে দিয়েছে টিলাটাকে।

গাছের তলাটা প্রায় পরিষ্কার এবং সমতল। আহমদ মুসা তার পিঠের ব্যাগের পকেট থেকে শক্ত নাইলনের ওয়াটার ওয়্যার বের করে নিল। উভচর কোট বৃষ্টিতেও কাজে লাগে, আবার সাগরে নামার জন্যে খুবই নিরাপদ। হাঙ্গর-কুমিরের দাঁত তো দুরের কথা বুলেটও এই বিশেষ নাইলন ফুটো করতে পারে না।

প্যাক করলে ওয়াটার ওয়্যারটি হাতের মুঠিতে নেয়া যায়, খুললে বিরাট আকার নেয়।

আহমদ মুসা ওটা খুলে মাটিতে বিছিয়ে সাহারা বানুকে বলল, খালাম্মা এখানে বসে পড়ুন। কতক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করব তা বলা মুস্কিল। শাহ বানু ও আপনি বসুন। একটু কষ্ট কম হবে'।

'আমাদের কষ্টের কথা বলছ? নিজের দিকে একটু তাকাও তো বেটা। তোমার গা রক্তে ভেজা। প্রতি মুহূর্ত কি টেনশনে কাটছে তোমার! দু'বাহুর মত জীবন-মৃত্যু তোমার দু'পাশে। সে তুলনায় আমরা পরম সুখে। অথচ তোমার সব কষ্ট আমাদের জন্যেই'। বলল সাহারা বানু।

'মায়ের জন্যে সন্তানরা, বোনের জন্যে ভাইয়েরা তো কষ্ট করবেই। এ কষ্ট তাদের জন্যে কষ্ট নয়। কষ্টই যদি হবে, সন্তান, ভাই- এ সম্পর্ক তাহলে কেন?' বলে টিলার দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার চলার পথের দিকে অশ্রু সজল চোখে তাকিয়ে ছিল সাহারা বানু।

শাহ বানু তার মাকে টেনে নিয়ে ওয়াটার ওয়্যারে বসতে বসতে বলল, 'বিস্মিত হয়ো না আম্মা, আহমদ মুসার কাছে আল্লাহর এই গোটা দুনিয়া তাঁর একটা ঘর। এই ঘরের বাসিন্দা তুমি, আমি পর হবো কি করে?'

চোখ মুছতে মুছতে বলল সাহারা বানু, ‘আমি ভাবছি, ওর স্ত্রী আছে, সোনার টুকরো একটা সন্তান আছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার কোন বাঁধনে সে বাধা নয়। পরের জন্যে নিজকে এভাবে ভূলে যাওয়া অসম্ভব’। ভারী ও ভাঙা গলা সাহারা বানুর।

আল্লাহর সৈনিকরা নাকি এমনই হয়। আহমদ মুসা ভাইয়াই একথা বলেছিলেন। নিজের পিতা, মাতা, ভাইবোন, স্বামী-সন্তান, স্ত্রী-পুত্র, বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়-বানিজ্য সবকিছুর চেয়ে নাকি আল্লাহ, তার রসূল স. এবং তাঁদের কাজকে বেশি ভালবাসতে হয়’। শাহ বানু বলল।

‘এরাই সোনার মানুষ শাহ বানু। আল্লাহর সাহায্য এদের জন্যেই সাহারা বানু বলল।

আহমদ মুসা চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে তাকাল তারিকের দিকে। টিলার আগাছা আর ঘাসের উপর বসে ঘুমে ঢুলছিল তারিক।

আহমদ মুসা তার পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলল, ‘উঠে দাঁড়াও। যাও নিচে গিয়ে এই টিলায় বিশবার উঠা-নামা কর। ঘুম চলে যাবে’।

‘ধন্যবাদ স্যার। বলে তারিক টিলা থেকে নামা শুরু করল।

‘ভাইয়া ওর মাথায় বরফ আছে, সেখানে টেনশন প্রবেশ করলেও তা বরফ হয়ে যায়’। বলল শাহ বানু টিলার গোড়া থেকে। টিলার গোড়ায় সে মায়ের সাথে বসেছিল।

‘ঘুমের জন্যে মাথায় বরফ থাকতে হয় না। টেনশনের মধ্যেও ঘুম এসে যেতে পারে’। কৈফিয়তের সুরে বলল তারিক।

শাহ বানু মুখ খুলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তার আগেই বলে উঠল, ‘কোন কথা নয় শাহ বানু। বিতর্ক ‘ড্র’ থাকুক কোন সুসময়ের জন্যে’।

‘ঝগড়ার জন্যে আমি বলিনি ভাইয়া’। বলল শাহ বানু। কণ্ঠে কিছুটা ক্ষোভ।

'ঝগড়া নয়, আমি কথাটা ক্লিয়ার করার জন্যে বলেছি'। বলল তারিক।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তোমাদের দু'জনকে ধন্যবাদ'।

দূরবীনে আবার চোখ রাখল আহমদ মুসা। দূরবীনের দৃষ্টি উৎরাইয়ের পথ পেরিয়ে ওদিকের চড়াই পর্যন্ত বিস্তৃত।

হঠাৎ দূরবীনের দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল। চারজন তাদের ষ্টেনগান বাগিয়ে পথ ধরে উঠে আসছে।

আহমদ মুসা এদেরই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বিস্মত হলৌ ওদের সংখ্যা চারজন দেখে। সুস্মিতা বালাজী জানিয়েছে, ওরা দশজন এসেছে এদিকে। অবশিষ্ট ছয়জন কোথায় তাহলে? ওদের পেছনে আসছে?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, ওরা ভিন্ন পথ দিয়ে আসতে পারে। ওদের কৌশল এই হতে পারে যে, এরা চারজন আমাদের সংঘর্ষে নিয়ে আসবে, আর ওরা ছয়জন পেছন থেকে আমাদের উপর চড়াও হবে। এ পরিকল্পনা নিয়ে ওরা ছয়জন এ চারজনের আগেই নিশ্চয় যাত্রা করেছে। তাহলে তো ওরা অনেকখানি কাছে এসে গেছে।

সতর্ক হলো আহমদ মুসা। উঠে দাঁড়াল টিলার উপর। ছয় জন এদিকে আসার জন্যে রাস্তার কোন পাশটা বেছে নেবে ওরা?

তীক্ষন দৃষ্টি মেলে আহমদ মুসা গোটা পথটায় একবার নজর বুলাল। তার কাছে ধরা পড়ল, রাস্তার দক্ষিণ পাশ গোটাটাই কিছু খাড়া পাহাড় এবং গভীর খাদে ভরা। এ পাশ দিয়ে আসা অনেক সময়সাপেক্ষই শুধু নয়, ভীষন কষ্টকরও। সুতরাং এ পথ তারা অবশ্যই বিবেচনা থেকে বাদ দেবে। অতএব নিশ্চিত যে, ওরা উত্তরের জংগল পথেই আসছে।

আহমদ মুসাকে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত দেখে সাহারা বানু ও শাহ বানু দু'জনেই উঠে এসেছে। বলল সাহারা বানু, 'তুমি খুব ভাবছ, কিছু ঘটেছে বেটা?

'ওরা আসছে খালাম্মা। চারজনকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা তো দশ জন। আর ছয় জন নিশ্চয় অন্য পথে আসছে। মনে হচ্ছে আমাদেরকে এই চারজনের সাথে ব্যস্ত রেখে ঐ ছয় জন অন্যপথে এসে পাশ বা পেছন থেকে আমাদের উপর চড়াও হবার পরিকল্পনা করছে'।

উদ্বেগ ফুটে উঠল সাহারা বানুদের মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল সাহারা বানু।

এই সময় দু'টি শুকর ছানা পূর্ব থেকে এসে তাদের পাশ দিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে ছুটে পালাল পশ্চিম দিকে।

এদিকে নজর পড়তেই এক হাত তুলে আহমদ মুসা কথা বলতে নিষেধ করল সাহারা বানুদের।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছিল আহমদ মুসার। তার মনে হলো শুকর ছানার ভয়ের উৎস ঐ ছয়জন হতে পারে। তার মানে ওরা জংগলের এই প্রান্ত বরাবরই আসছে।

'খালাম্মা ঐ ছয়জন জংগলের এ প্রান্ত দিয়েই আসছে'।

বলেই চোখ ফিরাল আহমদ মুসা শাহ বানুর দিকে। বলল দ্রুত, 'শাহ বানু তুমি খালাম্মাকে নিয়ে রাস্তার ওপাশে টিলার আড়ালে চলে যাও। তারিকও যাও সাথে'।

নির্দেশ পেয়েই শাহ বানু ওয়াটার ওয়্যার তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'চল আম্মা'। শাহ বানু তারিকের দিকেও একবার তাকাল।

'চল শাহ বানু'। তারিকও বলল।

'কোন নির্দেশ ভাইয়া?' চলতে শুরু করে শাহ বানু বলল।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শুকিয়ে গেছে ওদের মুখ। কথা বলার সময় শাহ বানুর কণ্ঠ কাঁপছিল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'নির্দেশ হলো, ভয় পেয়ো না। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি, আমরা ওদের দেখেছি। আমরা বেটার অবস্থানে। আমাদের জন্যে এটা আল্লাহর সাহায্য। আর নির্দেশ হলো, তোমাদের সকলের কাছে লোডেড রিভলবার আছে। যদি কিছু করণীয় হয়, মন তোমাদের বলে দেবে যাও'।

আহমদ মুসার নিশ্চন্ত হাসি এবং আশার কথা শাহ বানুদের চলা অনেক সহজ করে দিল। সাহসও যেন ওরা ফিরে পেল। 'ধন্যবাদ ভাইয়া' বলে উঠল শাহ বানু ও তারিক একই সঙ্গে এবং ওরা চলে গেল।

আহমদ মুসা আবার টিলার শীর্ষে উঠে গেল।

ডাল পালা ও আগাছার আড়ালে ওটা সুন্দর জায়গা। ওখান থেকে একই সাথে রাস্তা ধরে আসা চারজন এবং জংগলের প্রান্ত দিয়ে আসা ছয় জন সকলকেই চোখে রাখা যাবে।

আহমদ মুসা দেখল রাস্তার চারজন চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে।

আহমদ মুসা অনুমান করল ছয় জনের অগ্রবাহিনী নিশ্চয় তিনশ গজের মধ্যে চলে এসেছে।

আহমদ মুসা পকেট থেকে ফুল লোডেড দু'টি রিভলবার হাতে তুলে নিল। আহমদ মুসার প্রধান মনোযোগ জংগলের দিকে। জংগল বড় বড় গাছে ভরা। তবে শাল জাতীয় গাছগুলোর দীর্ঘ কাণ্ড শাখা-পাতা শূন্য। তার ফলে জংগলের আকাশটা যতটা নিবিড়-ঘন, নিচটা ততটাই ফাঁকা। তবে মাটিতে প্রচুর আগাছা রয়েছে, আগাছার অনেকগুলো বেশ বড়ও। তাই জংগলের তলাটা সহজে দৃষ্টিগোচর নয়। বিশেষ করে রাস্তার প্রান্ত বরাবর প্রচুর ঝোপ জংগল রয়েছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে কেউ যদি লুকিয়ে আসতে চায়, তাহলে তারা সহজে চোখে পড়ার কথা নয়।

কিন্তু আহমদ মুসার চোখে দূরবীন থাকায় ঝোপ-ঝাড়ের গলি-খুঁজা তার কাছে অনেক স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আগাছা, শাখা-প্রশাখার সামান্য নড়া-চড়াও তার নজর এড়াচ্ছে না।

অবশেষে ওরা ছয় জন আহমদ মুসার দূরবীনে ধরা পড়ল।

ওরা ছয় জন ষ্টেনগান বাগিয়ে বৃত্তাকারে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। বৃত্তের সামনের দু'জনের চোখ সামনে, মানে পশ্চিমে, বৃত্তের দু'পাশের দু'জনের দৃষ্টি দু'দিকে, দক্ষিণ ও উত্তরে। আর বৃত্তের পেছনের দু'জন পেছনে চোখ রেখে কতকটা উল্টো হেঁটে এগিয়ে আসছে।

আহমদ মুসা মনে মনে প্রশংসা করল ওদের পরাকল্পনার।

আহমদ মুসা ভাবল, ওরা টিলার দেয়ালে এসে বাধা পাবে। তারপর তারা টিলা পেরিয়ে সোজা সামনে এগুবে টিলার উপরের এদিকটা সার্চ করতে আসবে কিনা এটা একটা বড় প্রশ্ন।

ওরা টিলার দেয়ালের কাছে এসে গেছে। সকলেই ওরা চারদিকে তাকাচ্ছে টিলায় ওঠার আগে।

আহমদ মুসা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রিভলবার বাগিয়ে।

ওদের বৃত্তের সামনের দু'জন অতিসন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে টিলার দেয়ালে উঠে দেয়ালের ওপাশ মানে পশ্চিম পাশটায় নজর বুলাল। ঠিক তাদের মতই বৃত্তের দক্ষিন পাশে যে ছিল সে টিলার দেয়ালে উঠে ক্রলিং করে টিলার দেয়াল বেয়ে অনেক খানি উপরে উঠে এল এবং চারদিকটা দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার নেমে গিয়ে বৃত্তে যোগ দিল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহমদ মুসা। লোকটি যদি আর দু'গজ এগুতো কিংবা আহমদ মুসা যদি টিলার একদম শীর্ষে আশ্রয় না নিত, তাহলে লোকটির চোখে পড়ে যেত।

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আহমদ মুসা এই মুহূর্তে ওদের আক্রমণ করতে চায় না। আহমদ মুসা চাইল পেছনের চারজনও আরও কাছে আসুক। যাতে একসাথে সবাইকে আক্রমণের আওতায় আনা যায়। আহমদ মুসার ইচ্ছা, ছয় জনের দলকে তাদের পেছন থেকে এবং চার জনের দলকে সামনে থেকে সে আক্রমণ করতে চায়। তার আরও লক্ষ্য হল, কেউ যেন লুকবার সময় না পায়।

ছয় জনের বৃত্তটি টিলার দেয়াল পেরিয়ে সামনে এগুলো।

গজ চারেক এগুবার পর হঠাৎ বৃত্তের সামনের দু'জন থমকে দাঁড়াল। তাদের একজন নিচু হয়ে মাটি থেকে একখণ্ড কাগজ হাতে তুলে নিল।

আহমদ মুসার দূরবীনে ধরা পড়ল চকলেটের একটি মোড়ক। হয় শাহ বানু, নয়তো তারিক চকলেট খেয়ে ওটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আহমদ মুসাই দিয়েছিল ওদের চকলেট।

চকলেটের কাগজটি পেয়ে মুহূর্তেই ছয় জনের বৃত্তটির সবাই মাটিতে শুয়ে পজিশন নিল। ওরা চারদিকে তাকাচ্ছিল। ওদের সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টি

ওরা চারদিকটা ভালোভাবে দেখে নেবার পর তাদের সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো টিলার দিকে। সেই আগের মত বৃত্তাকারে চারদিকে চোখ রেখে তারা এগুলো টিলার দিকে। তাদের হাতের অস্ত্রগুলো উদ্যত এবং ট্রিগারে আঙ্গুল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত, এবার ওরা টিলা সার্চ না করে ফিরবে না।

আহমদ মুসা অত্যন্ত সন্তর্পণে টিলার মাথাটা ডিঙ্গিয়ে ওপারের ঢালটায় চলে গেল। রিভলবার দু'টো মাটিতে রেখে লাইট মেশিনগানটার ব্যারেল ওদিকে ঘুরিয়ে নিল আহমদ মুসা।

কিন্তু ব্যারেল ঘুরাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল। একটা বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ওপাশে নিচের দিকে।

ওটা ওদের নজরে পড়তে দেরি হলো না।

সংগে সংগেই ওদিক থেকে শুরু হলো ব্রাশ ফায়ার।

মেশিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে আহমদ মুসা অপেক্ষা করছিল।

প্রায় পঞ্চাশ রাউন্ডের মত গুলীর পর গুলী কমে এল।

সম্ভবত! ওরা রেজাল্ট দেখার জন্যেই গুলী কমিয়ে দিয়েছিল।

আহমদ মুসার হাত মেশিনগানের ট্রিগারেই ছিল। ওদের গুলী কমার সঙ্গে সঙ্গে আহমদ মুসা মাথাটা তুলে মেশিনগানের ব্যারেল টার্গেটের বরাবর নিয়ে গুলী বৃষ্টি শুরু করল।

মেশিনগানের ব্যারেল কয়েকবার ঘুরিয়ে প্রায় পনের সেকেন্ড ট্রিগার চেপে রাখল। দশ সেকেন্ড গুলীর পর ওদিক থেকে গুলীর শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা চকিতে একবার পেছন ফিরে তাকাল পেছনের চারজনের অবস্থান দেখার জন্যে। দেখল, ওরা কাছে চলে এসেছে। ষ্টেনগান বাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটে আসছে ওরা। ওদের লক্ষ্য টিলা্

আহমদ মুসা ঘুরিয়ে নিল তার লাইট মেশিনগান। ট্রিগার টানল মেশিনগানের। শুরু হলো গুলী বৃষ্টি।

ওরা ছিল বৃত্তাকারে। আর এরা চার জন ছিল রাস্তার আড়াআড়ি একটা লাইনে।

গুলীবৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ছুটে রাস্তার ওপাশের জংগলে ঢুকে গেল। দু'জনের লাশ পড়ে গেল রাস্তায়।

গুলী বন্ধ করে আহমদ মুসা টিলার পশ্চিম পাশে ছয় জনের অবস্থা দেখার জন্যে হামাগুড়ি দিয়ে টিলার পশ্চিম পাশে চলে এল। ওপারে গিয়েই দেখতে পেল টিলার গোড়ার কয়েকগজ দূরে ওরা ছয়জন বৃত্তাকারেই মরে পড়ে আছে।

আহমদ মুসা দ্রুত নিচে গেল। ভাবল দু'জন ওরা ওপারের জংগলে ঢুকেছে, এখনি যেতে হবে ওপারের টিলার দিকে।

কিন্তু এ ভাবনা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার কানে প্রায় একসাথে দু'টি গুলীর শব্দ এসে প্রবেশ করল। সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। আর কোন গুলীর শব্দ হলো না। স্বস্তি ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুখে। সে নিশ্চিত, গুলী দু'টি শাহ বানু ও তারিকের রিভলবারের এবং গুলী দু'টি ছোঁড়া হয়েছে ওপাশের জংগলে পালানো দু'জনকে লক্ষ্য করেই। আর তারা দু'জনই মারা গেছে। ওদের ষ্টেনগানের কোন গুলী শোনা যায়নি। তার মানে ওরা গুলী করার সুযোগই পায়নি।

তাকাল আহমদ মুসা টিলার দিকে। দেখল, শাহ বানু, সাহারা বানু ও তারিক টিলার নিচে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহমদ মুসা ওদিকে তাকাতেই শাহ বানু বলল 'ভাইয়া আমরা আসতে পারি?'

'এস'। আহমদ মুসা বলল।

শাহ বানুরা এপারে এলে আহমদ মুসা বলল, দু'জনের দু'সফল গুলীর জন্যে ধন্যবাদ'।

বিষ্ময় নামল শাহ বানু ও তারিকের চোখে-মুখে। বলল শাহ বানু, 'ভাইয়া জানলেন কি করে যে, আমরা দু'জনে গুলী করেছি এবং তা সফল হয়েছে?'

'ওদের দু'জনের হাতে ষ্টেনগান ছিল, আর তোমাদের হাতে ছিল রিভলবার। দু'গুলী একসাথেই হয়েছে। তোমাদের গুলীর পরে ষ্টেনগান থেকে কোন গুলী হয়নি। এ সবই আমার কথার প্রমাণ'। বলল আহমদ মুসা। 'আল্লাহকে ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনি এতদ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ভাইয়া?' শাহ বানু বলল।

‘বেটা, তুমি ওদের ধন্যবাদ দিচ্ছ তোমার প্রাপ্য ধন্যবাদ আড়াল করার জন্য বুঝি!’ বলল সাহারা বানু।

‘পানিতেই যার বাস, তার কাছে পানি নতুন নয়, কিন্তু পানিতে যারা নতুন পা দিল, ধন্যবাদ তো তাদেরই প্রাপ্য খালাম্মা’। আহমদ মুসা বলল।

‘আমাদের এত বড় স্বীকৃতি দিচ্ছেন ভাইয়া? বেশি হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমি, মেয়েরা, এই মহান কাজে অচল’। বলল শাহ বানু। তার কণ্ঠ গম্ভীর।

‘শাহ বানু, মেয়েদের এমন ছোট করে দেখলে, মানুষের অর্ধেকটাই ছোট হয়ে যায়। অথচ মোগলদের নূরজাহান, মুসলিম শাসক চাঁদ সুলতানা, বীর নারী হামিদা বানু প্রমুখের ইতিহাস তোমরা জান’। আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া! আপনি..................।

আহমদ মুসার মোবাইল বেজে উঠায় শাহ বানু কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

আহমদ মুসা মুখের কাছে তুলে নিল মোবাইল। বলল, ‘জি আপা, ওয়া আলাইকুম সালাম’।

‘ছোট ভাই ভাল আছেন আপনারা? গুলী-গোলার শব্দে আমরা এখানে উদ্বিগ্ন’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘হ্যাঁ ভাল আছি। ওদের দশজনই মারা গেছে, আলহামদুলিল্লাহ’।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা তাহলে এখন আসছেন?’

হ্যাঁ আসছি। ওদিকের খবর কি?’

‘এই মাত্র আমাদের স্কুলের গার্ড টেলিফোন করেছিল। গোলা-গুলীর শব্দ শুনে ওরা খুব খুশি। এ খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আমি টেলিফোন করলাম’।

‘হতে পারে, গোলা-গুলী শুনেই ওরা ধরে নিয়েছিল তারা শত্রুদের খতম করেছে। যাক ওখানে এখন ওরা কয়জন আছে?’

‘ওরা দশ এগার জন আছে’।

‘ঠিক আছে আপা। আপনার যেভাবে আছেন, সেভাবেই থাকুন। আমরা আসছি।

‘ঠিক আছে ছোট ভাই। সালাম’।

‘আসসালামু আলাইকুম’।

আহমদ মুসা মোবাইল পকেটে রেখে বলল, ‘চল আমরা যাত্রা করি। তার আগে শাহ বানু ও তারিক তোমরা অ্যামুনিশনের বাক্সের সাথে সাথে ওদের ষ্টেনগানগুলো কাঁধে তুলে নাও। আমাকেও কিছু দাও’।

‘না, ষ্টেনগানগুলো আমি নেব’। বলে সাহারা বানু ষ্টেনগানগুলো কুড়িয়ে নেবার জন্যে এগুলো।

‘না খালাম্মা, আপনি নন। ওরাই পারবে’। আহমদ মুসা বলল।

‘বেটা, তুমি না এইমাত্র নূরজাহান, সুলতানা রাজিয়াদের উদাহরণ দিলে। আরও উদাহরণ আছে। ভারতের বেগম হযরত মহল, ইসলামের প্রাথমিক যুগের বীর নারী খাওলার মত যুদ্ধের ময়দানে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন অসংখ্য মুসলিম নারী। তাহলে আমি এই কয়টা ষ্টেনগান বহনের অধিকার পাব না কেন? সন্তানদের যুদ্ধে মা কি অংশ নিতে পারে না?’

‘ধন্যবাদ খালাম্মা। আমাদের মায়েরা এইভাবে জেগে উঠলে আমাদের জাতি নতুন এক সোনালী দিনের মুখ অবশ্যই দেখবে’। বলে আহমদ মুসা নিজে ষ্টেনগানগুলো কুড়িয়ে সাহারা বানুর কাঁধে ঝুলিয়ে দিল।

তারা গ্রীনভ্যালির উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করল।

রাস্তায় উঠে আসতেই আহমদ মুসার মোবাইল আবার বেজে উঠল।

মোবাইল নিয়ে মুখের কাছে তুলে ধরে বলল, ‘জি আপা, আসসালামু আলাইকুম। কোন নতুন খবর?’

‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ছোট ভাই এইমাত্র আমদের স্কুলের গার্ড জানাল, এইমাত্র ওদের সর্দার ওদের সবাইকে গ্রীনভ্যালি ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। যে দশ জন উপকূলের দিকে গিয়েছিল সবাই মারা গেছে। ওরা বলেছে, আবার তৈরি হয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে খুব শীঘ্রই নাকি ওরা আবার আসবে’। গার্ড আরও জানাল জোর প্যাকিং চলছে দু’এক মিনিটের মধ্যেই ওরা যাত্রা শুরু করবে। ছোট ভাই, আমাদের এখন কি করণীয়?’ বলল সুস্মিতা বালাজী উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর।

‘বুঝেছি আপা। ভাই সাহেব কোথায়?’

'বাইরে লোকদের কাছে গেছে। আমাকে বল তোমার পরামর্শ'।

'আপা প্রথম কথা হলো, ওদের কাউকেই গ্রীনভ্যালি থেকে যেতে দেয়া যাবে না। গ্রীনভ্যালির ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্যেই গ্রীনভ্যালির এসব কাহিনী বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয় কথা, ওরা প্রস্তুত হয়ে যাত্র শুরুর আগে ওদের আক্রমণ করা যাবে না। পালাবার সময় মানুষের মন দুর্বল হয়, ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ প্রায়ই থাকে না। তৃতীয় কথা, ওরা যখন পালিয়ে যাবার জন্যে রাস্তায় উঠবে, তখন উত্তর দিকে রিংরোডের সংযোগস্থলে যারা আছে, তারা আক্রমনে আসবে। এই আক্রমণে তারা পেছনে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে দৌড়াবে, তখন পূর্ব দিকে হাইওয়ে গামী রাস্তার পাশে যারা আছে, তারা পাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে'।

'ধন্যবাদ ছোট ভাই, সুন্দর পরিকল্পনা'। বলল সুস্মিতা বালাজী।

'শুনুন আপা, আমাদের এখানে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে শংকরাচার্য নেই। তাহলে তিনি ওখানেই আছেন। তাকে জীবন্ত ধরতে পারলে ভাল। একটু দেখবেন'।

'কঠিন কথা বলেছেন ছোট ভাই, এটা কে দেখাবে? আপনার মত মাথা ঠাণ্ডা করে, পরিকল্পনা করে গুলী করার লোক আমাদের নেই'।

'ঠিক আছে আপা, আল্লাহ ভরসা। যেটা হবার সেটাই হওয়া উচিত। আর কোন কথা আপা?'

'না, আপাতত নেই। আপনারা যতটা সম্ভব দ্রুত আসুন। কি হবে আমার ভয় করছে। রাখলাম। আসসালামু আলাইকুম'।

'ওয়া আলাইকুম আসসালাম' বলে মোবাইল বন্ধ করল আহমদ মুসা।

শাহ বানুরা সবাই তাকিয়ে ছিল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা সংক্ষেপে সুখবরটা ওদের দিল।

যাত্রা শুরু হল আবার।

# ৭

সামনে একটু নিচেই গ্রীনভ্যালি।

পাহাড়টা ছোট হলেও উপত্যকার প্রায় গোটাই দৃষ্টিতে আসছে।

আহমদ মুসারা শেষ উৎরাই হয়ে নামছে।

নিচে গ্রীনভ্যালি উপত্যকা।

এই সময়ই শুরু হলো প্রচণ্ড গুলীগোলা। চলল দু'আড়াই মিনিট ধরে।

এক সময় থেমে গেল গুলীর আওয়াজ।

শাহ বানুরা সবাই তাকাল আহমদ মুসার দিকে। মুখ তাদের শুকনো উদ্বিগ্ন তারা। বলল শাহ বানু, কিছু বুঝছেন ভাইয়া?

'কিছু বুঝা তো যাচ্ছে। দু'আড়াই মিনিটে যেগুলী হয়েছে, তাকে তিনটি ওয়েভে বিভক্ত করা যায়। তিন ওয়েভের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি আমি মনে করি আমাদের লোকদের। আমাদের লোকরা পেছন থেকে শংকরাচার্যের পলায়নরত লোকদের উপর গুলীবর্ষণ করে। পলায়নরতরা এর জবাব দিতে শুরু করে। গোলা-গুলীর প্রাবল্য এই সময় বেশি ছিল। এর পর গুলীবর্ষণ শুরু হয় হাইওয়েগামী রাস্তার পাশে ওঁৎ পেতে থাকা আমাদের লোকদের পক্ষ থেকে। এই ওয়েভ-গুলীর পাল্টাগুলীর শব্দ তেমন পাওয়া যায়নি। এ থেকে বুঝা যায়, এমন অবস্থায় এমন আকস্মিকভাবে এই আক্রমণ আসে পাল্টা গুলী চালানোর সময় ও সুযোগ তাদের ছিল না। আর এর অর্থ হলো, শত্রুরা সম্পূর্ণ পরাভূত। হয়তো সবাই মরে গেছে'।

'তাহলে আমরা মুক্ত। আমাদের আর কোন ভয় নেই'। আনন্দ-উচ্ছ্বাস কম্পিত কণ্ঠে বলল শাহ বানু।

'আলহামদুলিল্লাহ'। বলল সাহারা বানু।

পাহাড়ের গোড়ায় নেমে এসেছে আহমদ মুসারা।

এই সময় আহমদ মুসারা দেখতে পেল, উপত্যকার পথ ধরে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসছে একদল আদিবাসী নারী-পুরুষ। তাদের সামনে ড্যানিশ দেবানন্দ এবং সুস্মিতা বালাজী। আনন্দে হৈচৈ করছে সবাই।

ওরা এসে গেছে। আহমদ মুসারা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ড্যানিশ দেবানন্দ নিজে ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার কাঁধ থেকে লাইট মেশিন গান ও গ্রেনেড লাঞ্চার নামিয়ে নিয়ে ওগুলো দু'জন আদিবাসীর হাতে দিয়ে দিল। আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ড্যানিশ দেবানন্দকে।

ওদিকে সুস্মিতা বালাজী নিজে এগিয়ে প্রথমে সাহারা বানুর কাঁধ থেকে ষ্টেনগানগুলো এবং পরে শাহ বানুর মাথা থেকে গুলীর বাক্সটি নামিয়ে নিয়ে কয়েকজন আদিবাসী মেয়ের হাতে তুলে দিল। তারপর সে একসাথে জড়িয়ে ধরল সাহারা বানু ও শাহ বানু দু'জনকে। বলল সে, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম ওয়েলকাম'। গভীর আবেগ তার কণ্ঠে।

বাহুর বন্ধন থেকে দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে সুস্মিতা বালাজী সাহারা বানুর হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'খুশি হয়েছি খুব। উম্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি আপনাদের'। তারপর মুখ ঘুরাল সুস্মিতা বালাজী শাহ বানুর দিকে। এক হাতে নত মুখটি তুলে ধরে বলল, 'আর মোগল শাহজাদী! তোমাকে যেমন ভেবেছি, তার চেয়েও তুমি মিষ্টি। তুমি সুষমার বন্ধু না? তোমার কাছে তার অনেক গল্প শুনব'। বলে শাহ বানুকে কাছে টেনে তার কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, 'আমার সৌভাগ্য তোমাদের পেয়েছি। গত বিশ বছরে এই প্রথম এমন আনন্দ'।

বলেই সুস্মিতা বালাজী আবার ঘুরল সাহারা বানুর দিকে। বলল, 'জানেন আপনারা আমার কত ঘনিষ্ঠ অত্মীয়?'

'জানি মা, আমার হবু বউমা সুষমার তুমি বোন। সেই সূত্রে আমি তোমারও 'মা' হবার দাবী করতে পারি'। বলল সাহারা বানু।

সুস্মিতা বালাজী আবার জড়িয়ে ধরল সাহারা বানুকে।

'সুষি, ওরা কিন্তু খুব ক্লান্ত। চল আমরা ওদের নিয়ে ফিরি'। বলল ড্যানিশ দেবানন্দ সুস্মিতা বালাজীকে লক্ষ্য করে।

সুস্মিতা বালাজী সাহারা বানুর বুক থেকে মুখ তুলে ড্যানিশ দেবানন্দকে সাহারা বানু ও শাহ্ বানুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। তারিকেরও পরিচয় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ড্যানিশ বলল, 'এই ইয়ংম্যানকে আমি ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছি। ছোট ভাই আহমদ মুসা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তারপর শাহ বানুর দিকে স্নেহময় হাসিতে চেয়ে বলল, এও জেনেছি খালাম্মা যে, শাহ বানুর রিভলবার ইতিমধ্যেই দু'টি শিকার এবং তারিকের রিভলবার একটি সফল শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করেছে'।

ড্যানিশ দেবানন্দের কথা শেষ হতেই সেখানে হাজির হলো আহমদ মুসা। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'ভাই সাহেব, আহত শংকরাচার্যের ওখানে এখনই পৌঁছা দরকার'।

সুস্মিতা বালাজী এগিয়ে এল আহমদ মুসার দিকে। বলল, ছোট ভাই শংকরাচার্যকে আপনি জীবিত চেয়েছিলেন, জীবিতই পাবেন'।

'ধন্যবাদ আপা। চলুন সকলে আমরা যাই'। বলল আহমদ মুসা।

সবাই চলতে শুরু করল উপত্যকার অভ্যন্তরে।

সবার আগে হাঁটছে সুস্মিতা বালাজী দু'পাশে সাহারা বানু ও শাহ বানুকে নিয়ে। তার পেছনে আহমদ মুসা ও ড্যানিশ দেবানন্দ পাশা পাশি। পরে অন্য সকলে হাঁটছে।

আহমদ মুসারা পৌঁছল স্কুলের পূর্বে হাইওয়েগামী রাস্তাটায়। এখানেই একটা উঁচু জায়গায় ঘাসের উপর রাখা হয়েছে মহাগুরু শংকরাচার্যকে। তার দু'পায়েই গুলী লেগেছে। একটা গুলী বেরিয়ে গেছে। আর একটা পায়ে আটকে আছে।

সেখানে পৌঁছেই আহমদ মুসা বলল, 'গুলীটা এখনই বের করার ব্যবস্থা করতে হয় ভাই সাহেব'।

পাশেই ছিল সুস্মিতা বালাজী। সে বলে উঠল, 'অপারেশনের ব্যবস্থা আগেই এনে রেখেছি। কিন্তু অপারেশন করতে রাজি নন তিনি।

আহমদ মুসা তাকাল মহাগুরু শংকরাচার্যের দিকে। বলল, 'আপনার আপত্তি কেন?'

মহাগুরু শংকারাচার্যের চোখে-মুখে মহাক্রুব্ধ ভাব। বলল, 'আমাদের হয় ছেড়ে দেবে, নয় মেরে ফেলবে। আমি তোমাদের কোন চিকিৎসা চাই না, মরে গেলেও না'।

'কি মনে করেন? আপনাকে ছাড়া হবে?' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি সেই বিভেন বার্গম্যান মার্কিন নাগরিক। কিন্তু আসলে তুমি তো বিভেন বার্গম্যান নও। কে তুমি?' বলল শংকরাচার্য।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার পরিচয় এখন ইস্যু নয়। আপনাকেই নিয়েই কথা। এখন কথা বলুন তো, আন্দামানের এত লোককে আপনারা খুন করলেন কেন? কেন আপনারা আটকে রেখেছেন আহমদ শাহ আলমগীরকে?'

'তুমি জানতে চাইলে না যে, তোমরা আমাকে ছাড়বে কিনা, এ সম্পর্কে আমি কি মনে করি? দেখ তোমরা আমাকে ছাড়বে, এমন ভাবার মত বোকা আমি নই। তবে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পার, কিন্তু আটকে রাখতে পারো না, যেমন আমরা আটকে রেখেছি আহমদ শাহ আলমগীরকে। ড্যানিশ দেবানন্দও আমাকে হত্যা করতে পারে। কারণ আমি তার পিতা-মাতাকে হত্যা করেছি এবং তার সম্পত্তি গ্রাস করে তাদের বনবাসী করেছি'।

'কিন্তু আপনি এসব অপরাধ স্বীকার করছেন কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'এজন্যে যে আমার বাড়তি কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। বরং আমি এসব কথা বলে আনন্দ পাচ্ছি এ কারণে যে, তোমাদের মনে যাতনা কিছু বাড়াতে পারছি'। বলল শংকরাচার্য।

'আপনার আন্দামানের এত লোককে হত্যা করেছেন, আহমদ শাহ আলমগীরকে আটকে রেখেছেন, এ অপরাধও কি স্বীকার করবেন?' আহমদ মুসা বলল।

'স্বীকার করবো না কেন? এটা করতে পারাটা আমাদের জন্যে গর্বের'।

'আহমদ শাহ আলমগীরসহ ওদের অপরাধ কি তা বলার মত সাহস কি আপনার আছে?'

'আহমদ শাহ আলমগীরের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। তার প্রথম অপরাধ হলো, পবিত্র বংশ পেশোয়া পরিবারের এক কন্যাকে সে ভাগাতে চেয়েছিল। তার

দ্বিতীয় অপরাধ হলো, তার কাছে মূল্যবান কিছু জিনিস আছে যা আমাদেরকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু তাকে আমরা ছাড়ছি না'।

'ছাড়া, না ছাড়ার সবটা আপনাদের হাতে নয়, আপনার আজকের এই অবস্থা তার একটা প্রমাণ। সে যাক, এখন বলুন, ডজন ডজন যুবককে আপনার হত্যা করেছেন, তাদের কি দোষ ছিল?'

'আন্দামানের ইতিহাস থেকে মুসলমানদের নাম মুছি ফেলেছি। এখানকার মাটি থেকেও মুসরমানদের দর্শনীয় অস্তিত্ব আমরা মুছে ফেলব।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ইতিহাস থেকে কি মুছে ফেলতে পেরেছেন?

'আন্দামানের জেলখানা কিংবা কোথাও, মুসলমানদের উপস্থিতি এবং অবদানের কথা নেই। আন্দামানের সেলুলার জেলখানা উৎসর্গ করা হয়েছে দামোদর সাভারকারের নামে। অথচ ইতিহাস মানলে এ জেলখানা 'শের আলী'র নাম উৎসর্গ হওয়া উচিত ছিল। শের আলীর মত সফল স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতে আর দ্বিতীয় জন্মেনি। আন্দামানে নিজ হাতে সে ভারতের বৃটিশ শাসক লর্ড মেয়োকে খুন করে এবং এই কৃতিত্বের জন্যে গর্ব ভরে সেই এই সেলুলার জেলখানায় ফাঁসিতে জীবন উৎসর্গ করে। শের আলীর পর যার নামে সেলুলার উৎসর্গ হওয়া উচিত ছিল তিনি মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী। ভারতে প্রথম আজাদী সংগ্রামের একজন নায়ক ছিলেন তিনি এবং জেলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন আরও বহু নাম আছে যাদের প্রায় সবাই মুসলিম। তাদের নামে জেল উৎসর্গ হতে পারতো। কিন্তু আমরা শের আলী ও মাওলানা ফজল হকসহ সবার নাম আন্দামানের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে পেরেছি। তাদের নাম জ্বেলের কোন দর্শনীয় অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারব'।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আন্দামানের কয়েকটা ডকুমেন্ট ইতিহাসের সব নয়। আন্দামানের কয়েকটা লিষ্ট থেকে এদের নাম মুছে ফেললেও ইতিহাসে এদের নাম ঠিকই থাকবে। আর দামোদর সাভারকারকে গায়ের জোরে হিরো বানানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ হয়েছে ভারতের পত্র-পত্রিকার তরফ থেকেই। ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা 'ফ্রন্টলাইন' দামোদর সাভারকারকে স্বপক্ষত্যাগী ও বৃটিশের অনুগ্রহভোজী হিসাবে চিত্রিত করেছে।

দামোদর সাভারকার জ্বেলে থেকে বৃটিশ সরকারের কাছে যে চিঠি লিখে ছিলেন তার পুরোটা ছেপে দিয়েছে পত্রিকাটি। ঐ চিঠিতে সাভারকার বৃটিশের বিরোধিতা করা ভুল হয়েছিল স্বীকার করে বৃটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, কারগার থেকে ছেড়ে দিলে তিনি এবং তার ভাই যতদিন সরকার চায় ততদিন কোন প্রকার রাজনীতিতে জড়িত হবেন না (I and my brother are perfectly willing to give a pledge of not participating in politics………..I am sincere in expressing my earnest intention of treading the constitutional path and trying my humble best to render the hands of the British dominion a bond of love and respect and respect and a mutual help." 'Front line', April 8, 2005) বৃটিশের কাছে আনুগত্যের শপথগ্রহণকারী এই দামোদর সাভারকারকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে তার নামে সেলুলার উৎসর্গ করেছেন। এই মিথ্যাচার টিকবে না। ইতিহাসের এই প্রতিবাদ শুরু হওয়াই তার প্রমাণ। সুতরাং আন্দামানের মাটি থেকে আলমগীরদের মুছে ফেলা যাবে না'।

'তোমার বক্তৃতা শুনলাম। বৃক্তৃতা বা দু'কলম লিখে ইতিহাস লেখা যায় না। ইতিহাস লিখতে শক্তিরও দরকার হয়। শক্তিমানরাই ইতিহাস গড়ে। আমাদের এই শক্তি আছে'।

'আপনি এই কথা বলছেন?' আহমদ মুসা বলল।

'কেন বলব না। মনে করেছ, আমি ধরা পড়ে গেছি, আর সব শেষ হয়ে গেল। তা নয়। আমি ডুবো পাহাড়ের এক আইসবার্গ মাত্র।নিজেকে যতই টাইটানিক মনে কর, ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'এই ডুবো পাহাড় কে?'

'তা আমি বলব না'।

'না বলে তুমি যে মরতেও পারবে না, মরণও যে আসবে না'।

'আমি জানি। কিন্তু তুমি জীবন্ত কাউকে আমাদের ধরতে পেরেছ এখনও? কিংবা কাউকে ধরে রাখতে পেরেছ? পারনি। আমাকেও পাবে না'।

‘পারিনি বলে পারা যাবে না, একথা ঠিক নয়’। বলল আহমদ মুসা।

এ কথা বললেও আহমদ মুসা সতর্ক হয়েছিল শংকরাচার্যের মতলব সম্পর্কে। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার চোখ। শংকরাচার্যের না বলা কথাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসা কাছে।

আহমদ মুসার বঞ্চল চোখ ঘুরছিল শংকরাচার্যের দু’হাত ও তার জামার বোতামের উপর। শংকরাচার্যের বাম হাতটা ডান হাতের উপর রাখা ছিল বলে ডান হাতের পুরোটা দেখতে পাচ্ছিল না আহমদ মুসা।

‘আপনার ডান হাতটা দেখি’ বলে আহমদ মুসা নিচু হচ্ছিল শংকরাচার্যের ডান হাত ধরার জন্যে।

কিন্তু শংকরাচার্য চোখের পলকে তার ডান হাত টেনে নিয়ে তর্জনিটা মুখে পুরল।

আহমদ মুসা ঝাঁপিয়ে পড়র শংকরাচার্যের উপর। চেষ্টা করর তার ডান হাতের তর্জনিটা মুখ থেকে টেনে নেবার জন্যে। কিন্তু পারল না আহমদ মুসা। শংকরাচার্য তার সর্বশক্তি দিয়ে তার দেহটাকে উপুড় করে ফেলল।

আহমদ মুসা যখন তাকে আবার চিৎ করল এবং তার হাত মুখ থেকে বের করল, তখন শংকরাচার্যের দেহটা নীল হয়ে গেছে।

তার হাতটা দেহের উপর ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। হতাশ কণ্ঠে বলল, ‘পারলাম না তাকে বাঁচাতে’।

‘আংটিতে তাহলে পটাসিয়াম সাইনাইড ছিল’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘শয়তানকে শাস্তি তাহলে শয়তান নিজেই দিল। ড্যানিস দেবানন্দ বলল।

‘হ্যাঁ, ভাই সাহেব। ব্যক্তি শয়তান নিজেকে শাস্তি দিয়ে শয়তানের ‘ডুবো পাহাড়’কে বাঁচিয়ে গেল’।

‘ছোট ভাই আপনার উদ্যোগ আর একটু আগে হলে কি হতো জানি না’। বলল সুস্মিতা বালাজী।

‘তার ডান হাতেই যে পটাসিয়াম সাইনাইড আংটি আছে, এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে আমার’।

‘দুঃখ করবেন না ছোট ভাই। শয়তানের এইভাবে চলে যাওয়াই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। আমি খুশি হয়েছি। একটা কুগ্রহ আমাদের জীবন থেকে সরে গেল। আমাদের স্বেচ্ছা-নির্বাসন জীবনের ইতি ঘটল। আমি ও সুস্মি আজ থেকে মুক্ত’।

‘কনগ্রাচুলেশন আপা, ভাই সাহেব’। বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ছোট ভাই। কিন্তু আপনি তো শয়তানের ‘ডুবো পাহড়ে’র সন্ধান পেলেন না। তার কি হবে?’ সুস্মিতা বালাজী বলল।

গম্ভীর হলো আহমদ মুসা। বলল, ‘আইসবার্গ হারিয়ে যাওয়ায়, শয়তানের, ‘ডুবো পাহাড়’ পানির তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল বটে, কিন্তু শয়তানের জিন্দানখানা নামক আইসবার্গ, যেখানে এক মোগল শাহজাদা বন্দী আছেন, তা আমার সামনে রয়েছে। সেখানে গেলে আমি বন্দী শাহজাদাকে উদ্ধার করতে পারব এবং শয়তানের ‘ডুবো পাহাড়ে’র সন্ধানও আরেকবার পেয়ে যাব’।

আহমদ মুসা থামল।

সঙ্গে সঙ্গে ‘আমিন’ বলে উঠল সাহারা বানু, শাহ বানু এবং তারিক একই সঙ্গে। তারপর সুস্মিতা বালাজি এবং ড্যানিস দেবানন্দও।

‘ইনশাআল্লাহ’। বলল আহমদ মুসাও।

পরবর্তী বই

# ডুবো পাহাড়

কৃতজ্ঞতায়ঃ

1. Anisur Rahman
2. Abdullah Al Mahmud
3. Mohammed Sohrab Uddin